দুঃখের বা সুখের জন্য

মতি নন্দী

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীঅরুপকুমার সরকার
আনন্দ প্রিণ্টার্স
৪৯ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

প্রথম সংস্করণ : জুলাই ১৯৫৯

রমাপদ চৌধুরীকে

॥ এক ॥

"তাকিয়ে দেখ, সমুদ্রের উপরের আকাশের মত। তাই না? মনে হচ্ছে গড়িয়ে পড়েছে।"

নিখিলের কথা অনুসরণ করে তপতী তার দৃষ্টি আকাশ বরাবর উত্তর-দক্ষিণ করিয়ে, ছোট্ট করে ঘাড় নাড়ল। রাস্তাটাও সোজা দক্ষিণে চলে গেছে। মাঝামাঝি কচ্ছপের পিঠের মত উঁচু হওয়ায় এবং দক্ষিণে দৃষ্টিরোধকারী কোন গাছ বা বাড়ি ইত্যাদি না থাকায় আকাশটা ঢালু হয়ে নেমে এসেছে বলেই মনে হয়।

"স্কুলের ভূগোল বইয়ের ছবিতে ছিল। পৃথিবীটা যে গোল তার প্রমাণ সমুদ্রে অনেক দূরের জাহাজ দেখা যায় না। যত এগিয়ে আসে ততই একটু একটু করে দেখা যায়। এইবার আমরা একটু একটু করে এগিয়ে যাব আমাদের জমির দিকে। এখন আমরা জাহাজ, আর জমিটা ডাঙা।"

শেষ ক'টি কথা বলার সময় নিখিলের গলার স্বর এত খাদে নেমে এল, তপতীর রোমাঞ্চ হল। কানে ঠোঁট ছুঁইয়ে বলার মত। এ রকম গলা শুনলে তপতীর আঠারো বছরের হয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

কলকাতা শহরতলির উত্তর-পূর্ব কিনারে বাস ওদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে। শ্যামবাজার থেকে বাসে আধঘণ্টার দূরত্ব। রাস্তা পার হয়ে সামনের নতুন কলোনীটির দিকে দুজনে মুগ্ধ হয়ে তাকাল। কচ্ছপপিঠওলা রাস্তাটি কলোনীকে দু'ভাগে ভাগ ক'রে সোজা চলে গেছে। বাসরাস্তা থেকে বাড়িগুলি তৈরী হতে হতে পিছু হটেছে। কলোনীর অর্ধেক এখন বাড়িতে ছাওয়া। পিছনদিকে ধু-ধু মাঠ, মাটি ফেলে নিচু জমি ভরাট হচ্ছে। দু-চার বর্ষা না গেলে আর বাড়ি উঠবে না।

বাঁ হাতে কোঁচাটি সামান্য তুলে, একতলা ছোট্ট বাড়িটি থুতনি নেড়ে দেখিয়ে নিখিল বলল, "এ বাড়িটা যাঁর, তাঁর মত ইকনমিস্ট ইণ্ডিয়াতে খুব কমই আছে।"

বাড়িটির দিকে তপতী সমীহভরে তাকাল। নিখিলের চলার ভঙ্গি বাড়িটির সামনে এসেই বদলে গেল। কোমর থেকে উর্ধ্বাংশ শক্ত করে ঝুঁকিয়ে, আঙুলের ভর দিয়ে, হাত দুটো ফাঁক করে, সামনে-পিছে ঈষৎ দুলে-দুলে হাঁটতে শুরু করেছে। সিনেমায় দেখা জমিদারদের মত মনে হল তপতীর। তবে নিখিলের ঢ্যাঙা, পাতলা চেহারাটা মোটেই জমিদার-জমিদার না হওয়ায় তার হাসি পেল। রাশভারি হওয়ার জন্য নিখিল যে সব পন্থা অবলম্বন করে এটি তার অন্যতম। কুড়ি বছর ধরে তপতী ওর দুর্বলতাগুলোর সঙ্গে পরিচিত।

"এই তো ক'মাস আগে, একটা ডেলিগেশনের লীডার হয়ে রাশিয়া ঘুরে এলেন।"

বলতে বলতে নিখিল পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে, আড়চোখে তপতীর দিকে তাকাল। দামী সিগারেটের প্যাকেটে কমদামী সিগারেট রাখা নিয়ে বহুবার ঠাট্টা করেছে তপতী। কিন্তু এখন বাড়িগুলো দেখতে দেখতে বলল, "ফাঁকা ফাঁকা, কলকাতার মত গায়ে গা লাগানো নয়। এখানে এলে ভাবাই যায় না কলকাতায় মানুষ কি করে বাস করে।"

সিগারেট ধরাতে দুটো কাঠি নিভেছে। তৃতীয়টি জ্বালাতে বাতাস পড়ে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকায় নিখিল জবাব দিল না এই সময় চারজন গৃহিণী, তপতীরই বয়সী, গল্প করতে করতে একটি বাড়ি থেকে বেরোল। তারা একবার পিছু ফিরে নিখিল-তপতীকে দেখলও। সিগারেট ধরেছে। ওরাও হাঁটা শুরু করল।

"এখানকারই।" নিখিল কোঁচাটি আবার সামান্য তুলে নিল

"তাছাড়া আর কোথাকার হবে, দেখছ না কেমন আলগা হয়ে সবাই চলেছে।"

"এখানে অত কড়াকড়ি নেই চলাফেরার, এটা খুব ভাল

মেয়েদের এই স্বাধীনতা না থাকলে তাদের মনের প্রসার হয় না। শুধু পরচর্চা আর ঘুম ছাড়া তো বৌয়েদের আর কোন কাজই নেই।" গম্ভীর হবার চেষ্টায় থুতনিটা চেপে চিবুকে ভাঁজ ফেলে নিখিল সিগারেটে টান দিল।

"বাইরে বেরোবার স্বাধীনতা ক'টা বৌয়েরই বা আছে?"

"তোমার তো আছে।"

"আমি কি পরচর্চা করি?"

"ঘুমোও তো। আর সেইজন্যই তো দিনদিন মোটা হচ্ছ।"

তপতী এই কথাটি শুনলে সাধারণত বলে, "একে আবার মোটা বলে নাকি!" বা "তোমার চোখে তো আমি মোটা ছাড়া আর কিছু নই।" কিন্তু এখন সে কথা না বলে শুধু সামনে চলা গৃহিণীদের দিকে তাকিয়ে থাকল। একজন বেশ ছিপছিপে, ত্রিশের কাছাকাছি বয়স মনে হল। বাকি তিনজনের, তপতীর ধারণায়, তার মতই গড়ন।

"ওদের মধ্যে কে বেশি মোটা বলো তো?" তপতী প্রশ্ন করল।

"আমি পরস্ত্রীদের দিকে তাকাই না।" আকাশমুখো হয়ে নিখিল ধোঁয়া ছাড়ল।

"থাক্ থাক্, পুরুষদের চিনতে আমার আর বাকি নেই।"

"পুরুষদের পরীক্ষা করে করে দেখেছ বুঝি?"

"দেখেছিই তো।" বলেই অপ্রতিভ হয়ে তপতী দ্রুত জুড়ে দিল, "হাঁড়ির একটা ভাত টিপলেই সব বোঝা যায়।"

এই সময়, পাশের সরু রাস্তা থেকে বাজারের থলি হাতে এক প্রৌঢ় একটু ব্যস্ত হয়ে বেরোল। গৃহিণীরা তাকে কি জিজ্ঞাসা করার জন্য দাঁড়িয়েছে। ওদের অতিক্রম করে যেতে যেতে নিখিল-তপতী শুনল প্রৌঢ় বলছে, "হঠাৎ এসে পড়েছে। আসবে জানলে বাজার-টাজার করে রাখতুম। মঞ্জুকে আজই নিয়ে যেতে চায়।"

প্রৌঢ় ব্যস্ত হয়েই চলে গেল। নিখিল-তপতী শুনল পিছনে বলাবলি হচ্ছে:

"কাণ্ড দেখ, এইতো বাপের বাড়ি এল, দু'হপ্তাও হয়নি।"

"বেচারাকে দু'দিন জিরোবারও সময় দেবে না!"

"কি রকম মোটা হয়ে গেছে মঞ্জুটা, দেখেছ হাসুদি?"

"হবে না, যা টানের বহর।"

"দেখগে, হয়তো মঞ্জুই চিঠি লিখে আনিয়েছে।"

ওদের সম্মিলিত হাসি পাশের একটা রাস্তায় ঢুকে গেল।

"এগুলো কি? পরচর্চা নয়?" তপতী তির্যক স্বর নিক্ষেপ করল। তাইতে নিখিলের ঠোঁট দু'টি উত্তর দেবার জন্য ছিলেটানা ধনুকের মত বেঁকে উঠে আবার স্থির হয়ে গেল। কিন্তু টঙ্কারের মত একটা হাসি চোখে লেগেই রইল। সঙ্গে সঙ্গে তপতীর মনে পড়ল বিয়ের মাসছয়েক পরের একটা ঘটনা। তখন সে মামার বাড়িতে। নিখিল অফিসফেরৎ পরপর তিনদিন হাজির হয়। রাতের খাওয়া সেরে নিখিল চলে যাবার পর মাসীমা বলেছিল—"বলা নেই কওয়া নেই, জামাই যদি হুট্ হুট্ করে হাজির হয়, এই আক্রাগণ্ডার বাজারে আমাদের চলে কি করে। বড়লোক তো আর নই বাপু।" মামা চাপা গলায় বলেছিলেন, "আস্তে বলো। তপু শুনতে পেলে মনে দুখু পাবে। মা নেই, বাপ থেকেও নেই। এইটেই তো ওর বাপের বাড়ি। প্রথম প্রথম তো এরকম হবেই। তারপর ঘর-সংসার পেতে বসলে কি আর এমুখো হবে?" আড়াল থেকে শুনতে শুনতে তপতী মরমে মরে যাচ্ছিল। পরদিনই নিখিলকে চিঠি দেয়, তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। অবশ্য কারণ হিসাবে যা লিখেছিল, এখন তা ভাবতেও লজ্জা করে।

"আমার মনে হয়, মঞ্জু মেয়েটাই চিঠি দিয়ে আনিয়েছে।" তার অনুমানটা তপতীর চোখেমুখে কি ভাবে অনুমোদিত হয় দেখার জন্য নিখিল পাশে মুখ ফেরাল। তপতীর মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটল। আশ্চর্য, কুড়ি বছর প্রায় হতে চলল, তবু বলা হয়নি। নিখিল এত সুখবোধ করেছিল চিঠিটা পেয়ে, যা দেখে তার মায়া হয়েছিল কারণটা আজও গোপন রয়ে গেছে নিখিলের কাছে। বলে

একটা মিথ্যা সুখকে লালন করার জন্য এখন অপ্রতিভ করিয়ে কি লাভ, বরং গোপনই থাক। তপতী হঠাৎ ঝরঝরে বোধ করল পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

একটা বাড়ি তৈরী হচ্ছে। একতলা শেষ হয়ে দোতলার কাজ শুরু হয়েছে। রবিবার, তাই মিস্ত্রিদের কাজ বন্ধ। কর্তা-গিন্নীই হবে, বাড়ি দেখতে এসেছে। রাস্তায় মোটর দাঁড়িয়ে, সঙ্গে আর একজন। সম্ভবত কণ্ট্রাক্টর। গিন্নী মেঝের দিকে হাত নেড়ে উত্তেজিত হয়ে কিছু বলছে, গভীর মনোযোগে দু'জন শুনছে।

"বেশ পয়সাওলা মনে হচ্ছে!"

"যে রকম হাঁকিয়েছে তাতে হাজার পঞ্চাশেক তো ইতিমধ্যেই খরচ হয়ে গেছে।" বাড়িটার আপাদমস্তক লক্ষ্য করতে করতে নিখিল বলল। আর তপতী লক্ষ্য করল, নিখিল বাড়িটাকে সম্ভ্রম জানাতে ব্যস্ত হওয়ায় রাশভারি চলনে ঢিলে দিয়েছে।

"এইটুকু করতেই এত খরচ?"

"লাগবে না! ভিত্‌টাই তো প্রায় তিন কাঠার মত, জমি কম করে দশ কাঠা তো হবে।"

"আমাদের মাত্র তিন কাঠা।"

"মাত্র মানে! এখন এই তিন কাঠার দাম কত জান?"

নিখিলের স্বরে এমন এক ধরনের সুখের শব্দ বাজল যাতে তপতীর বুকের মধ্যে এখানকার ধুলো, খোয়া, গর্ত, ড্রেন ইত্যাদি সমেত সামনের মাঠ ও আকাশকে নিয়ে সমুদ্রের মত কিছু একটা ঝিলিক দিয়ে উঠল।

"নশো টাকা কাঠা কিনেছি এখন পাঁচগুণ দাম হয়েছে। অফিসের অনেকেই বলছে এইবেলা বেচে দিতে।"

"সে কি!"

"পাগল, বেচবার জন্য কি কিনেছি। তখন অনেককেই বলেছিলুম কিনতে, কেউ গা করেনি, এখন ওরা হিংসে করে আমায়", নিখিল তৃপ্তি সহকারে শেষ টান দিয়ে ক্যারম স্ট্রাইকারে টোকা দেওয়ার মত

করে সিগারেটটাকে সামনে ছুঁড়ল।

তপতী আবার সুখের শব্দ পেল। যতই এগোচ্ছে দু'ধারে বাড়ির সংখ্যা কমে আসছে। সমুদ্রের কাছাকাছি হবার মত একটা উত্তেজনা তার স্নায়ুতে চাপ দিচ্ছে। সাজগোজ করে একটি পরিবার কোথায় যেন চলেছে। তার মধ্য থেকে একটি বাচ্চা ছুটে গেল বাগানওলা বাড়িটার ফটকে। তপতী ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে দেখতে মন্থর হয়ে পড়ল। দু'টি চেয়ারে পরিপাটি হয়ে বসে আছে দুই বুড়ো-বুড়ি। তারা একসঙ্গে ঘাড় নাড়ল। বাচ্চাটি ফটক দিয়ে ঢুকে একটি চন্দ্রমল্লিকা ছিঁড়ে নিয়ে আবার ছুটে পরিবারের মধ্যে ফিরে এল। ঘাড় উঁচিয়ে যতক্ষণ দেখা যায়, দেখে, বুড়ো-বুড়ি হেসে নিজেদের মধ্যে কি আলাপ করল।

"নিঃসন্তান বোধহয়।" নিখিল তার অনুমান জানিয়ে দিল।

"কিংবা এমনও হতে পারে, হয়ে মারা গেছে।" তপতী নরম গলায় যোগ করল।

"ছেলেরা হয়তো বিদেশে চাকরি করে।"

"তাও হতে পারে। আবার আমাদের মতই হয়তো এদেরও এক মেয়ে। তার বিয়ে হয়ে গেছে। ওই বাচ্চাটার মত হয়তো একটা নাতি আছে।" বলতে বলতে তপতী গল্প বানাবার আমেজ বোধ করল। "মাঝে মাঝে মেয়ে আসে। তখন বুড়ো-বুড়ির খুব আনন্দ হয়। সারাদিন নাতির সঙ্গে খেলা করে। তারপর মেয়ে আবার শ্বশুরবাড়ি চলে যায়। ওরা তখন আবার এইভাবে—" তপতী অপ্রতিভ হয়ে থেমে গেল নিখিলকে হাসতে দেখে।

"বেশতো বলছিলে।" সিগারেটের জন্য নিখিল পকেটে হাত ঢোকাল।

"হাসছ যে, আমাদের কথাটা ভেবেছ? ওই বয়সে আমরা কি করব।"

"এখনো অনেক দেরি আমাদের বুড়ো হতে।"

"কে বলল, তুমি তো হয়েই গেছ। কানের পাশের সব চুল

পেকে গেছে, কপালটা তো বাড়তে বাড়তে চাঁদিতে গিয়ে ঠেকছে। কথাবার্তাও আজকাল বুড়োদের মত বল। আগে তবু অফিস থেকে ফিরে কাছে বসে দু'চারটে কথা বলতে। এখন তো বসে বসে খালি ভুরু কুঁচকে কাগজ পেন্সিল নিয়ে বাড়ির প্ল্যান করা, নয়তো আপন মনে বিড় বিড় করা, আর একটুতেই বিরক্তি।"

নাটকের সংলাপ পড়ার মত তপতী গড়গড়িয়ে বলে ফেলল। নিখিল অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে করতে সিগারেট ধরাতে দাঁড়াল।

"তুমি আর আগের মত নেই।"

"কেই বা থাকে।" প্রথম ধোঁয়া ছেড়ে নিখিল হাটতে শুরু করল। "বয়স হচ্ছে না! দায় দায়িত্ব বেড়েছে, সবকিছুই দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে। ছেলেছোকরাদের মত আর কি চলা যায়। যা হবার তা হয়ে গেছে, নতুন করে আর কিছু হবে না। এখন গুছিয়ে বসার চেষ্টা শুধু।"

নিখিলের বলার ভঙ্গিতে এক ধরনের কাতরতা ফুটে উঠল। এই নির্জন বিস্তৃত শূন্য মাঠের দিকে যেতে যেতে তপতীর মনে হল, এ রকম স্বর শুনলে বুকের মধ্যে ভগ্নস্তূপ গড়ে ওঠে, শিরার মধ্যে শ্যাওলা জমে, প্রাচীন লতা-গুল্মের গন্ধ দেহে লেগে যায়। এই স্বর শুনলে বিষণ্ণতা বয়সের রূপ ধরে যৌবনে ফিরে যায়।

"রুবির ছেলেমেয়েকে কাছে এনে রাখব। আমরাই মানুষ করব।"

"আগে ওর বিয়ে হোক তারপর তো! তুমি দেখছি এখনই নাতি-নাতনির কথা ভাবতে শুরু করেছ। আসলে বয়স তোমারই বেড়েছে।"

"তা তো বলবেই।" তপতী ঘাড় বাঁকিয়ে কুড়ি বছর আগেকার মত করে তাকাবার এবং নিখিলও কিছুটা বখাটে হাসি হাসবার চেষ্টা করল। তারপর দু'জনেই যখন বুঝল ব্যাপারটা জমল না তখন এধার ওধার তাকিয়ে একটা কিছু দৃশ্য খুঁজতে শুরু করে দিল দৃষ্টি নিবদ্ধ করার জন্য।

"ওই যে ঝোপের মত জায়গাটা, শালিকগুলো ওড়াওড়ি করছে, ওইখানেই।" নিখিল আঙুল তুলে দেখাল।

প্রথমেই দূরের গাছপালা গ্রাম প্রভৃতির দ্বারা দিগন্তে যে কালো রেখা টানা তার কিছু উপরে কমলা রঙের সূর্যটি তপতীর চোখে পড়ল। দীর্ঘকাল এমন নিখুঁত গোলাকৃতি উজ্জ্বল কোনো বস্তু সে দেখেনি। বিস্ময় সামলে নিয়ে বলল, "এত দূরে, এত ফাঁকার মধ্যে!"

"এইতো ভাল। কলকাতার চীৎকার চেঁচামেচি থেকে দূরে কেমন শান্ত নির্জন। এই রকম পরিবেশেই তো বাকি দিনগুলো বাস করা উচিত।"

তপতী বলতে যাচ্ছিল দোকান, বাজার, বাসরাস্তা থেকে বড় দূর হয়ে গেল। কিন্তু নিখিল এমন স্নিগ্ধ সূর্যাস্তের প্রাক্কালে এত গাঢ় স্বরে কথাগুলো বলল, তাতে প্রত্যহের নিছক দরকারী ব্যাপারগুলোর উল্লেখ মনে হল বেমানান হবে। তাই মানানসই করে তপতী বলল, "এখন মনে হচ্ছে সত্যি সত্যিই মাঝ সমুদ্রে এসে পড়েছি। কি জোর হাওয়া দিচ্ছে।"

রাস্তার দু'ধারের জমিতে হাঁটু সমান আগাছার জঙ্গল। সিমেণ্টের পিলার দ্বারা জমিগুলো প্লটে ভাগ করা। প্রত্যেক পিলারের মাথায় সিমেণ্টের কাঁচা অবস্থায় আঁচড় কেটে প্লট নম্বর লেখা। ঘন আগাছায় সব প্লটই দূর থেকে একাকার দেখাচ্ছে। বাড়ি তৈরীর কোন চেষ্টা কলোনীর এই দিকটায় এখনো শুরু হয়নি। রাস্তাটিও তাই অর্ধ-সমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। কলোনীর আবাস অঞ্চল ছাড়িয়ে ওরা এখন দূরে এসেছে।

নিখিল রাস্তা থেকে জমিতে নামল। তার পিছনে তপতীও। আগাছা ঠেলে এগোতে ওদের বেগ পেতে হল। মাঝে মাঝে কাঁটা-ঝোপও আছে। ভাঙা ইঁটের টুকরোয় বা ঘাসে ঢাকা চোরা গর্তে বেটাল হয়ে, মুখে বিরক্তিসূচক শব্দ করতে করতে দু'জন এক জায়গায় দাঁড়াল।

"এইটে আমাদের জমি।"

"কি করে বুঝলে, সবই তো একরকম দেখাচ্ছে।" তপতী ভ্রূ কুঞ্চিত করে চারধারে তাকিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করল।

"পিলারের নম্বর দেখলেই বোঝা যাবে।" নিখিল ঝুঁকে দুহাতে আগাছা সরাতে লাগল। মাটি থেকে প্রায় এক ফুট উঁচু করে চার কোণে চারটে পিলার গাঁথিয়েছিল। কিন্তু এখন তার একটিও দেখতে পেল না। ওর মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল। তপতী উদ্বিগ্ন হল।

"কি হল, পাচ্ছ না?"

"আছে নিশ্চয়। ধার-দেনা করে একটি একটি করে পয়সা জমিয়ে জমিয়ে কেনা জমি যাবে কোথায়।" খুঁজতে খুঁজতে নিখিল বলল তপতী একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। নিখিল ঝুঁকে এগিয়ে যাচ্ছে দু'হাতে আগাছা সরিয়ে। ক্রমশ সে আরো ঝুঁকে পড়ছে। মুখটা সূর্যের দিকে ফেরান। গনগনে হয়ে উঠেছে ওর ফর্সা চামড়া। কপাল থেকে মাথার মাঝ বরাবর পাতলা চুলের অংশটুকুতে পোড়ামাটির রঙ ধরেছে। আগাছার মধ্যে কোমরভাঙা দেহটিকে পোড়োবাড়ির একটা টুকরোর মত বারকয়েক মনে হল তপতীর। যখন মাঝে মাঝে এধার ওধার তাকাচ্ছে, দু'চোখে কখনো ভয়, কখনো চাপা রাগ ঠিকরে বেরোল। কানের পিছনের শিরাটা ফুলে উঠেছে।

"কি হল, কোথায় জমিটা?" তপতী চাপা গলায় বলল। আমারও খোঁজা উচিত, এই মনে হওয়ায় সে নিখিলের দিকেই এগিয়ে গেল। নিখিলের আঙুলে কাঁটা ফুটেছে। চুষতে চুষতে সে অধৈর্য হয়ে বলল, "জমি তো আর বাক্সপ্যাঁটরা নয় যে কেউ উঠিয়ে নিয়ে যাবে, নিশ্চয়ই আছে।"

শাড়িটা হাঁটু পর্যন্ত তুলে তপতীও পিলার খোঁজায় ব্যস্ত হল নিখিলের কথায় ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলল, "সীমানা না থাকলে জমি হয় নাকি। সীমানা মানেই মালিকানা।"

"সীমানা না দিয়েই কি জমি কিনেছি। নিশ্চয় পিলার ভেঙে ইটগুলো চুরি করে নিয়ে গেছে।" নিখিল কাঁটাঝোপের মধ্যে দু হাত ঢুকিয়ে ডালপাতা সরিয়ে সরিয়ে খুঁজে চলল। দু হাতের তালুতে

রক্তের ছড় ফুটেছে। উন্মাদের মত হ্লোলাটে চোখে মাঝে মা
তপতীর দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করল—"ছাড়ব না, আমি কিছুতে
ছাড়ব না, ম্যাপ আছে, দলিল আছে, যাবে কোথায়। বার আ
করবই।"

লুটিয়ে পড়া আঁচল বুকের কাছে জড়ো করে, সিধে হয়ে তপত
বলল, "কোমর ধরে গেল।" কিন্তু নিখিলের বিরক্ত চাহনি দেখামা
আবার ঝুঁকে পড়ল এবং মনে হল একটা কালোমত কিছু যেন মাটি
মধ্যে থেকে ফুঁড়ে উঠেছে। চীৎকার করে উঠল সে, "এই তো।"

ছুটে আসতে গিয়ে নিখিল হুমড়ি খেয়ে পড়ল। উঠতে উঠে
বলল, "কই, কই।" কাছে এসে হাঁটু গেড়ে আগাছা উপড়া
উপড়াতে বলল, "যাবে কোথায়। চুরি জোচ্চুরির পয়সায় কেনা ন
মুখের রক্ত তুলে কামানো পয়সায় কিনেছি, যাবে কোথায় শালা
তারপর মুখটা প্রায় মাটিতে ঠেকিয়ে নম্বর পড়তে পড়তে বলল
"ডি-টোয়েন্টিফোর। হ্যাঁ আমার। আমার পিলার।"

মুখ তুলে নিখিল হাসল তপতীর দিকে তাকিয়ে। ভয়, বিরক্তি
রাগ, অধৈর্য খান খান হয়ে কোমলতার স্তর ওর মুখমণ্ডল ভে
করে বেরিয়ে এল। পিলারটায় একটা লাথি মেরে নিশ্চিন্ত স্ব
বলল, "তাহলে বাকি তিনটেও পাওয়া যাবে।"

উঠে দাঁড়িয়ে গ্রীবা উদ্যত করে নিখিল চারধারে তাকাল। ও
দীর্ঘ শরীর এখন আরো দীর্ঘ দেখাচ্ছে। বহু প্রাচীন শক্ত গাঁথুনি
একটা শিলাস্তম্ভের মত এখন মনে হচ্ছে তপতীর, পুরুষ মানুষ বলতে
এই রকমই বোঝায়। কি অদ্ভুত লাগছে এখন মানুষটাকে
তারপর তপতী অভ্যাসমত আঁচলে মুখ মুছে বলল, "যা ভ
ধরেছিল।"

"ভয়, কিসের ভয়?" সসাগরা পৃথিবীর অধিপতির মত নিখিল বলল
"মানুষ যাবে, মান মর্যাদা যাবে, সম্পর্ক যাবে, চরিত্র যাবে, কিন্তু জ
চিরকাল থাকবে।"

হঠাৎ কাঁটা দিল তপতীর সর্বাঙ্গে। নিখিলের মাথার পিছনে

সূর্যটা। মনে হচ্ছে ওর মাথা থেকেই জ্যোতি ঠিকরে বেরোচ্ছে, ঠিক নারায়ণের পটে যে রকম আছে। নিখিল যেন নারায়ণ হয়ে জমির উপর দাঁড়িয়ে, বিশ্বচরাচর লুপ্ত হয়ে গেছে, শুধু চিরকাল ধরে রয়েছে এই তিন কাঠার জমিটা।

"এই পিলার ধরে তুমি সোজা বাষট্টি ফুট উত্তরে যাও, আমি যাচ্ছি দক্ষিণে। বাষট্টি ফুট মানে তোমার প্রায় বাষট্টি স্টেপই হবে। দু'জনের একজন না একজন পেয়ে যাব। দুটো পিলার পেলে বাকি দুটো বার করা সোজা।"

নিখিলের কথামত দু'জন পিলার থেকে দুদিকে এগিয়ে গেল এবং তপতীই আবার চীৎকার করে বলল, "পেয়েছি।" ব্যস্ত না হয়ে, নিখিল হাত নেড়ে বলল, "ওখান থেকে এবার নাক বরাবর চল্লিশ স্টেপ পুবে যাও।"

একটু পরেই তপতী চীৎকার করল, "হ্যাঁ, ঠিক আছে।"

"নম্বরটা দেখে নিয়েছ ?"

পিলারের মাথার উপর ঝুঁকে তপতী ঘাড় নাড়ল।

"তাহলে এবার সোজা বাষট্টি স্টেপ দক্ষিণে।"

চতুর্থ পিলারটি তপতী খুঁজে পেল না। নিখিলও খুঁজল।

"মনে হয় চুরিই গেছে", তপতী চিন্তিত হয়ে পড়ল। "পাশের লোক পাঁচ-দশ হাত নিয়ে নিতে পারে তো।"

"পাশের জমিটা যে কিনেছে শুনেছি নাকি সাহিত্যিক। পিছনেরটা কিনেছে বড়বাজারের এক দোকানদার। মাঝে মাঝে এসে দেখে যেতে হবে আর কি। আজকাল মানুষকে বিশ্বাস নেই।"

ওরা আগাছা ভরা জমি থেকে রাস্তায় উঠে এল। দিগন্তের কালো রেখায় সূর্য আধখানা কাটা পড়েছে। অনেক দূরে লাউডস্পীকারে গান বাজছে, হাওয়ার দমকে মাঝে মাঝে জোরে ভেসে উঠছে। বাদুড় উড়ে চলেছে। একটা কুকুর দুলকি চালে যেতে যেতে মুখ ঘুরিয়ে নিখিল-তপতীকে দেখে নিল। এই ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে

কোথায় যাচ্ছে, দেখার জন্য তপতী লক্ষ্য করতে লাগল। দূরে ঝুড়িমাথায় এক স্ত্রীলোক তুটো বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের দিকে চলে যাচ্ছে। এমন গভীর সূর্যাস্ত তপতী কখনো দেখেনি। নিঃসঙ্গতা ঢালু হয়ে দিগন্তে মিশে যাচ্ছে। নিজেকে তার পরিত্যক্তা বোধ হচ্ছে।

"বসার মত জায়গা কোথাও নেই।" নিখিল বলল।

"ওই উঁচু দিকটায় বেশ ঘাস আছে।"

ওরা পাশাপাশি বসল জমির দিকে মুখ করে। বসার আগে রুমাল বিছিয়ে নেয় নিখিল। এই পাটভাঙা ধুতি পাঞ্জাবি পরেই কাল তাকে অফিস যেতে হবে। হুমড়ি খেয়ে পড়ার জন্য হাঁটুর কাছের কাপড়ে ময়লা লেগেছে। পাঞ্জাবীতে রক্তের ছোপ। তপতী ওর হাত টেনে নিয়ে দেখতে দেখতে বলল, "বিষিয়ে যেতে পারে। বাড়ি গিয়েই গরম জলে ধুয়ে ওষুধ লাগাতে হবে।" শুনে তাচ্ছিল্যে ঠোঁট মোচড়াল নিখিল। জোর বাতাসে পাঞ্জাবিটা বুকের সঙ্গে লেপটে থাকায় গেঞ্জীর ছেঁড়া গর্তগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অর্ধনিমীলিত চোখে নিখিল বলল, "ভিত দোতলারই করব। পরে দোতলা তুলে একতলাটা ভাড়া দেওয়া যাবে।"

"রিটায়ার করতে তো বছর বারো বাকি।"

"তাতে কি হয়েছে। যদি ভাড়া দেওয়া যায় তাহলে দেনাগুলো শোধ করতে পারব। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে তো লোন পেয়েছি মাত্র দেড়হাজার টাকা। ব্যাটারা অনিল বিশ্বাসকে নাইন্টি পারসেন্ট লোন দিল আর আমার বেলায় নিয়ম দেখাল, ছ'মাসের বেসিকের বেশি দেওয়া যায় না। তেল দিতে পারলে সবই পাওয়া যায়, সবই পাওয়া যায়।"

"না না, ওসব করতে হবে না। বরং কষ্টেসৃষ্টে যেমন চলছে চলুক। তাতে বাড়ি হোক্ চাই নাই হোক্।"

নিখিল কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বলল, "চরিত্রটাই আসল জিনিস মানুষের। তাই দিয়েই মানুষকে চেনা যায়। অনিল বিশ্বাসদের মত

লোকেরা তো কেঁচো। ওর কোন মর্যাদা আছে নাকি।"

ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে তপতী শুনছিল। একই কথা প্রতিবার বলে—চরিত্র যার নেই সে কেঁচো। এবং কথা অনুযায়ী সে চলেও। স্ত্রীরা দুশ্চিন্তা বোধ করতে পারে এমন কোন ব্যাপার আজও নিখিলের মধ্যে খুঁজে পায়নি তপতী। এজন্য তার প্রচুর সুখ ও গর্ব। তবে বিরক্তও হয় মাঝে মাঝে। যেন বাড়াবাড়িই করে চরিত্র নিয়ে। সচ্চরিত্রতা দেখাতে ও যেন একটু বেশি আগ্রহী। অন্যের বাহবা কুড়োতে কুড়োতে যেন ওর পিঠটাই বেঁকে আছে। সবাই বলে নিখিল সৎ ন্যায়বান, নিরপেক্ষ, পরিশ্রমী। নিখিলের মা মারা যাবার পর বাবা আবার বিয়ে করেন। জুয়া এবং মদের খরচ সামলাতে না পেরে বসত বাড়িটি বিক্রি করতে বাধ্য হন। বাড়ি তপতী দেখেনি। তবে বাবার প্রতি নিখিলের চাপা ঘৃণাটা সে লক্ষ্য করেছে। উপলক্ষ্য পেলেই তা মাঝে মাঝে ফেটে বেরোয়ঃ "ওর জন্যই আজ আমরা ভাড়াটে। দুর্বলচরিত্র শুধু নিজেরই নয়, বংশেরও মান ডোবায়।"

তপতী ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে দেখল নিখিলের উত্তেজিত ভঙ্গি। এই বিরাট নির্জনতায়, সূর্য অস্ত যাবার মুহূর্তে, চতুর্দিকে প্রাণের চিহ্নবিহীনতার মাঝে এই ভঙ্গি ধীরে ধীরে তার নিঃসঙ্গবোধ কাটিয়ে তুলতে সাহায্য করল, মাথার পিছনে আর জ্যোতির্বলয় দেখা যাচ্ছে না। নিখিলকে এখন প্রতিদিনের সংসারী মানুষ মনে হচ্ছে।

তপতী ছেঁড়া ঘাসের শীষগুলি বাতাসে উড়িয়ে দিতে দিতে বলল, "বাড়ি করার আগে রুবির বিয়েটা দিতে হবে। অন্ততঃ সাত-আট হাজার লাগবেই। হাতে তো কিছুই জমানো নেই। বাড়ি বরং দশ বছর পরে করলেও চলবে।"

"আজকের এক টাকার জিনিস তখন দশ টাকায় কিনতে হবে। আয় তো আর সে অনুপাতে বাড়বে না।"

"তবে কি রুবির বিয়ে এখন দেবে না? আঠারো বছর যে বয়স হয়ে গেল!"

"হোক্ না। সবে তো প্রি-ইউ পড়ছে, এম-এটা পাশ করুক।

আজকাল তো চব্বিশ-পঁচিশ বয়সেই বিয়ে হচ্ছে। লেখাপড়াটা তে এমনিই করা উচিত, বিয়েতেও অনেক হেল্প্ করে। ক্লাশ টেন পর্যং না পড়ে অন্তত যদি বি-এ পর্যন্ত পড়তে, তাহলে কি আমার সঙ্গে বিয়ে হতো তোমার?"

নিখিল পিটপিটিয়ে হাসছে। তপতীও মুচকি হেসে বলল, "হতে নাই তো। ব্যারিস্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গেই বিয়ে হতো অ্যাদ্দিনে গাড়ি চেপে ঘুরে বেড়াতুম। একগণ্ডা ঝি-চাকর থাকত গা-ভর্তি গয়না। এই রকম দু'গাছা চুড়ি আর পনেরো টাকার তাঁতে শাড়ি পরে বেরোতুমও না, দুশো টাকার মধ্যে সংসার চালাবার কথ ভেবে ভেবে মাথা খারাপও করতুম না।"

বলতে বলতে শেষদিকে তপতীর গলা ভারী হয়ে আসছিল সামলে নিয়ে জোরে হেসে উঠল। নিখিলও হাসবার চেষ্টা করে বেশি জোর দিয়েই বলল, "সেই জন্যই তো বলছি রুবি এম-এ-টা পাশ করুক। তোমার মত দুঃখ যেন না পায়।"

"থাক থাক। আমার দুঃখ নিয়ে আর এই বয়সে ভাবতে হবে না। কত তো বোঝ ওসব," তপতী মুখ ঘুরিয়ে কাঁধের উপর থুতনি রেখে আলতো স্বরে বলল। "আমার দুঃখ তুমি কোন দিনই বোঝনি বুঝতেও চাওনি।"

"কুড়ি বছর প্রায় হয়ে গেল, তুমি তো একদিনও বলোনি তোমার দুঃখের কথা।"

"তুমি জানতে চেয়েছো কি কখনো?"

"বেশ, এখন বল।"

"না, এভাবে জিজ্ঞেস করলে বলব না।"

"তাহলে কিভাবে, কখন জিজ্ঞেস করব?"

তপতী আর উত্তর দিতে পারল না। নিখিল তাকিয়ে আছে চোখাচোখি হতেই তার গা কেঁপে উঠল। দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ চেপে সে মাথা নাড়তে লাগল। তারপর মুখ তুলে খাপছাড়াভাবে বলল "হাওয়ায় কি রকম সোঁ সোঁ শব্দ হয় কানের গোড়ায়। একেই বলে

রাবণের চিতা জ্বলার শব্দ। ওর চিতা যতদিন না নিভছে ততদিন অমর।”

“আমরা শ্মশানে আছি নাকি!”

“আসল সমুদ্র তো একবারও দেখালে না। বিয়ের পর বিমানমামা বলেছিলেন, ওঁর পুরীর বাড়িতে বেড়াতে যেতে। তুমি তো রাজী হলে না।”

“হওয়া যায় নাকি! তোমার ওই বিমানমামাটি পুরীর বাড়িতে মেয়েমানুষ নিয়ে গিয়ে যা সব হুল্লোড় করত। সেই বাড়িতে কোন ভদ্রলোকের না যাওয়াই উচিত। বদনাম হবে। নিজের মায়ের সহোদর ভাই হলে নয় কথা ছিল। এই রকম দুশ্চরিত্র মদোমাতাল যে কি করে তোমার মামা হয়! অতবড় সম্পত্তি উড়িয়ে এখন ভিখিরির হাল।”

তপতী বরাবরই লক্ষ্য করেছে বিমানমামাকে নিখিল একদমই পছন্দ করে না, তাই তাচ্ছিল্য দেখাতে ‘সেই’ ‘ওই’ প্রভৃতি শব্দগুলি নামের আগে ব্যবহার করবেই।

“বিমানমামার যত বদগুণই থাকুক না, মানুষ হিসেবে অত ভাল লোক হয় না। অমন সুন্দর ব্যবহার আজ পর্যন্ত কারুর কাছে পাইনি।”

নিখিল চুপ করে রইল। সূর্য দিগন্তরেখার নীচে নেমে গেছে কিন্তু রশ্মির আভায় আকাশে ঢিমে আলো ছড়ান। সেই আলোই স্তিমিত হয়ে নিখিলের চোখের কোলে, নাকের নীচে, চোয়ালের পাশে অন্ধকার গহ্বর খুঁড়ে রেখেছে। তাই দেখে তপতীর মনে হল, একটা জরাজীর্ণ ইঁট মুখে বসান। বলল, “সন্ধ্যে নেমে গেছে, ওঠো, ফেরা যাক।”

দাঁড়িয়ে উঠে নিখিল নিরাসক্ত গলায় বলল, “এই তোমার দুঃখ?”

“ধ্যাৎ, তাই বললুম নাকি।” তপতী অপ্রতিভতা সামলাতে প্রায় ধমকে উঠল।

"তাহলে ?"

"কিচ্ছু নেই।"

"তবে যে বললে।"

"এমনিই। মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছে করে দুঃখ পেতে অথচ তুমি একটুও দাও না। এইটেই আমার দুঃখ।"

তপতী চেষ্টা করেও নিখিলের মুখ দেখে বুঝতে পারল না কোন ভাবান্তর ঘটল কিনা। অলসভাবে হাঁটতে হাঁটতে তারা কলোনীর আবাস অঞ্চলের মধ্যে এল। পথে সামান্য দু'-চারটে কথা বলা ছাড়া কেউই মুখ খোলেনি। ফিরতি একটা খালি ট্যাক্সি ওদের পাশে আস্তে হয়ে গিয়ে হর্ণ দিতেই নিখিল হাত তুলে থামাল। তপতী চাপা স্বরে বলল, "না না, বাসেই যাব, বাজে খরচ করতে হবে না।"

ট্যাক্সির দরজা খুলে ইশারা করল নিখিল ভিতরে যাওয়ার। তপতী মুখে আপত্তি ছড়িয়ে ট্যাক্সিতে ঢুকল। আসার সময় দমবন্ধ হয়ে আসছিল ভিড়ে। সেইভাবে আবার যেতে হবে না, এই আরামটুকুর সম্ভাবনায় তার প্রতিবাদের ইচ্ছা কমজোরি হয়ে গেল। কিন্তু ট্যাক্সি চলতে আরম্ভ করা মাত্র যেন নিয়মরক্ষা করার জন্যই বলল, "এইসব বিলাসিতা বাপু আমার ভাল লাগে না।"

জবাব না দিয়ে নিখিল বাইরে তাকাল। হেলান দিয়ে, পা দুটো ছড়িয়ে দিল তপতী! বহুদিন ট্যাক্সি চাপেনি সে।

"আজকের বিকেলটা বেশ কাটল।"

নিখিল অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে। তপতী ওর হাতে হাত রাখল। তাইতে নিখিল চমকে উঠল।

"কি ভাবছ ?" তপতী মৃদু কণ্ঠে বলল।

"ভাবছি বাড়িটার প্ল্যানের কথা। সিঁড়িটা এমনভাবে করতে হবে যে নীচের ভাড়াটের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না।"

"ভাড়াটে রেখে কি দরকার।"

"আছে বৈকি। যা দিনকাল, পট্ করে মরে যেতে পারি, তখন

চলবে কি করে তোমার। অফিসের বিল্ডিং ফাণ্ড থেকে ধার নিতেই হবে। সেটা শোধ না দিতে পারলে বাড়িটা অফিস নিয়ে নেবে। ইনসিওরের তিন হাজার টাকা আর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের হাজার সাতেক টাকায় তো আর কারুর আজীবন চলতে পারে না। এছাড়া জমিটা কেনার ধারও এখনো শোধ হয়নি। সবদিক ভেবে তবেই সংসারী লোকদের চলতে হয়। আর এত ভাবতে গেলে সুন্দর ব্যবহার ইচ্ছে থাকলেও করা যায় না। যারা সংসার করেনি তারাই পারে।"

কেমন একটা বিষণ্ণতা, অক্ষম বাসনা তপতীর কানে ধরা পড়ল। নিখিলের অবয়বে ভগ্নস্তূপের ছাপ যেন আবার দেখা যাচ্ছে।

"এসব কথা থাক, আমার ভাল লাগে না শুনতে।"

"তাহলেও এসব আমায় চিন্তা করতেই হয়। ভবিষ্যৎ আমাকে বড় ভাবায়।" অন্যমনস্ক হয়ে নিখিল কিছুক্ষণ জানলার বাইরে তাকিয়ে থেকে আবার বলল, "তখন জমিটার উপর দাঁড়িয়ে আমার বুকের মধ্যে যেন কেমন করে উঠেছিল। ভয় হয়েছিল যদি সত্যিই খুঁজে না পাই। ভয়টার অবশ্য কোনই মানে হয় না। জমিটা কেনার সময় ভেবেছিলুম এরই উপর গড়ে তুলব আমার সংসার। বিয়ের সময়ও মনে হয়েছিল, তোমাকে নিয়েই গড়ব সংসার। জমিটা আর তোমাকে হঠাৎ একলহমার জন্য যেন সমান বলে মনে হল।"

শুনতে শুনতে তপতী চোখ বন্ধ করল। তার মনের মধ্যে এখন যেন কেউ কাঁদছে, কেউ যেন হাসছে। দুটোই সে শুনতে পাচ্ছে। নিঃসাড়ে সে চোখ বন্ধ করে রইল। ঠোঁটের কোলে ভেসে উঠল হালকা হাসি। গভীর হয়ে নিঃশ্বাস পড়ল। শরীর অবসাদে ভেঙে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ পর চোখ খুলেই দেখে নিখিল একদৃষ্টে ট্যাক্সির মিটারের দিকে তাকিয়ে।

"ব্যাস ব্যাস এখানেই।"

শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ের কিছুটা আগে ট্যাক্সি থামিয়ে

নিখিল ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়ল। বাড়ি এখান থেকে প্রায় আধমাইল। "আর একটুখানি তো, চলো হেঁটেই যাই।"

তপতী ঘাড় নাড়ল। নিখিল কৈফিয়তের সুরে বলল, "বাড়ি পর্যন্তই যেতে পারতুম। কিন্তু দশ টাকার নোটটা আর ভাঙাতে ইচ্ছে করল না। খুচরো করলেই তো চটপট খরচ হয়ে যায়।"

"তোমার গেঞ্জি কেনা দরকার। এখনি কিনে নাও।"

"আরো দিনকতক চলুক না।"

রাস্তায় গিজগিজে ভিড়। ওরা কথা না বলে হেঁটে চলল। শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় পার হয়ে পাশাপাশি হওয়া মাত্র নিখিল বলল, "রুবি একা রয়েছে বাড়িতে।"

"প্রদীপ নিশ্চয় এসে গেছে এতক্ষণে।"

প্রদীপ দত্ত নিখিলের ব্যাংকেই কাজ করে। বসেও একই ঘরে, তবে ডিপার্টমেন্ট আলাদা। বি-কম পাশ করে, ব্যাংকিং পরীক্ষার ফার্স্ট পার্টও পাশ করেছে। দ্বিতীয় পার্ট দেবার জন্য তৈরী হচ্ছে। বছর সাতাশ বয়স। ছিপছিপে। চটপটে, সুদর্শন। ওর বাবা নিখিলের সঙ্গেই কাজ করতেন। ট্রাম থেকে পড়ে দু'টি পা কাটা যাওয়ায়, ব্যাংক প্রদীপকে চাকরী দেয়। নিখিল তদ্বির করেছিল। সেই থেকে এ-বাড়িতে প্রদীপের যাতায়াত। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে সন্ধ্যা নাগাদ রোজই আসে রুবিকে পড়ায় সাহায্য করতে। ফেল করার জন্য স্কুলে দুবছর নষ্ট হয়েছে রুবির। প্রদীপের মাস্টারীতে নিখিল বা তপতীর আপত্তি নেই। তবে তপতী চোখে চোখে রাখে ওদের দু'জনকে। সম্পর্কটা ভাই-বোন বা শিক্ষক-ছাত্রীর বেশি যাতে না গড়ায় তাই নিয়ে মনে যথেষ্ট ভয় আছে তার। আটজনের সংসারে প্রদীপই একমাত্র রোজগারে। কষ্টেসৃষ্টেই চলে। এমন ঘরে রুবির বিয়ে দেবার ইচ্ছে তপতীর একদমই নেই।

"ছেলেটা খাটিয়ে আছে, উন্নতি করবে।"

নিখিল কোন মন্তব্য করল না। তপতী বলল, "রুবি বড় হয়েছে, আর বেশিদিন ওকে দিয়ে পড়ানটা ঠিক হবে না।"

"তাহলে কে তোমাকে বাড়ি বয়ে এসে ফাজলামো করে হাসাবে ?" বিরক্ত স্বরে নিখিল বলল। তপতী প্রতিবাদ করে কিছু বলতে গিয়ে আর বলল না।

প্রদীপ প্রায়ই অফিসের গল্প করে। নানান লোকের হাস্যকর অভ্যাসগুলো নকল করে হাসায়। নিখিল এই ব্যাপারটি একদমই পছন্দ করে না। একদিন তপতীকে বলেও 'সব মানুষের মধ্যেই হাসবার মত জিনিস থাকে। তোমার মধ্যে আছে, তাই নিয়ে যদি কেউ হাসাবার চেষ্টা করে কেমন লাগবে ?' 'সামনে তো আর করছে না।' তপতী আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বলে। নিখিল তাতে গম্ভীর হয়ে জবাব দেয়, 'ব্যাপারটা এভাবে দেখছ কেন, অন্যায়টা অন্যায়ই তা সামনে বা পিছনে যেখানেই ঘটুক-না কেন।' তপতী অতঃপর চুপ করে থাকে এবং বেশ কিছুক্ষণ পর বলে, 'অতশত বুঝি না বাপু, তবে যখন বলে শুনতে বেশ মজাই লাগে। সারাদিন একঘেয়ের মত কাটিয়ে, তারপর অত ন্যায়-অন্যায় খতিয়ে চলা যায় না। বেশ তো, সময় কাটাবার একটা কিছু উপায় করে দাও।' নিখিল চুপ করে থাকে এবং বেশ কিছুক্ষণ পর বলে, 'সময় কাটাবার সবথেকে ভাল উপায় প্রেমে পড়া। তুমি বরং প্রেমে পড়ে যাও।' 'এই বয়েস! কার প্রেমে পড়ব শুনি ?' 'কেন আমার। রোজ দুপুরে কি সন্ধ্যেয় বসে পাতার পর পাতা চিঠি লিখবে, দিব্যি সময় কেটে যাবে।' তপতী আঁতকে উঠে বলেছিল, 'ওরে বাবা, প্রেমপত্রের জবাবে তো তুমি সংসার খরচ কমাবার পদ্ধতি লিখবে নয়তো ন্যায়-অন্যায় কাকে বলে তাই বোঝাবার চেষ্টা করবে। দরকার নেই বাপু তোমার সঙ্গে প্রেম করে। যা নীরস বুড়োটে তুমি। তার থেকে বরং সত্যিকার কোন বুড়োর সঙ্গেই প্রেম করব।' হাসতে হাসতে নিখিল বলে, 'কার সঙ্গে, তোমার সেই বিমানমামা ?' 'থাক আর ঠাট্টা করতে হবে না। বিমানমামা এই সত্তর বছরেও এখনো অনেক ছোকরার থেকে জোয়ান। তুমি যদি ওর পাশে দাঁড়াও তোমাকেই—' দপ করে নিখিলের হাসিমুখটা নিভে যেতে

দেখে তপতী থতমত হয়ে গেছল।

"আমি বরং একবার অরুণবাবুর কাছ থেকে ঘুরে আসি। প্ল্যানটা করে রেখেছে, খবর দিয়েছে। তুমি হেঁটে যাবে, না ট্রামে যাবে?"

"হেঁটেই চলে যাই। একটু তো পথ।"

"তাহলে আমি যাচ্ছি। মার তো কাল একাদশী, তুমি মিষ্টি কিনবে? আচ্ছা আমিই নিয়ে যাব।"

নিখিল রাস্তা পার হয়ে ভিড়ে মিশে গেল। যতক্ষণ দেখা যায় তপতী ওকে দেখল। ঢ্যাঙা শরীরটা সামনে ঝুঁকিয়ে হাত দুটো দুলিয়ে হাঁটছে। রাশভারিত্বের ছিটেফোঁটাও এখন চলনের মধ্যে নেই। এখন ওকে দেখে হাসি পায়। তপতীর মনে হল, হয়তো অন্য কোথাও প্রদীপ এই হাঁটাই নকল করে দেখায়। নিজের চলন কেমন, তাই দেখার ইচ্ছে হল তপতীর। বড় কাচের জানলাওলা দোকানের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলে দেখা যেতে পারে। কিন্তু দিনের আলো ছাড়া তা সম্ভব নয়। রুবিকে দেখেছে, কলেজে যাবার আগে প্রায়ই আলমারির আয়নার সামনে হাত ছয়েক জায়গার মধ্যেই চলন দেখার কসরৎ করতে। দু' পা যেতে না যেতেই খাটে ঠোক্কর খেয়ে বিরক্তিতে মুখটা বেঁকিয়ে আবার শুরু করে। রুবির চলন ভাল গড়নও ভাল। পাশের বাড়ির মঙ্গলার মা বলে, 'মা'র মতনই গড়ন পেয়েছে মেয়ে, দেখলে মনে হয় চব্বিশ। কে বলবে আঠারো বছরের!' আঠারো বছরেই বিয়ে হয় তপতীর। নিখিল বলে, 'রুবিকে হুবহু ঠিক তোমার তখনকার মত দেখতে লাগে।' দিদিমার কাছে তপতী শুনেছে, 'তোকে দেখলে নীলুকে মনে পড়ে যায়। মায়ের ছাঁচ যেন অবিকল মেয়ের মুখে বসান।'

মাকে মনে পড়ে না তপতীর। তার একবছর বয়সেই নীলিমা জলে ডুবে, হরপুরে তাদের দেশের বাড়িতে মারা যায়। তপতীর ঠাকুমা আর বিধবা জেঠি থাকত হরপুরে। বাবা সরোজবরণ ঝরিয়ায় এক কোলিয়ারিতে চাকরি করতেন। ছুটিতে আসা-যাওয়া ছিল বছরে দুবার। আচমকা এক রাত্রে সরোজবরণ ঝরিয়া থেকে কলকাতায়

পৌঁছে হরপুরের ট্রেন না পেয়ে ট্যাক্সিতেই মাঝরাতে এসে হাজির হন। নীলিমাকে পরদিন ভোরে পুকুরে ভাসতে দেখা গেল।

কারণ কেউ জানে না। দুর্ঘটনা না হত্যা না আত্মহত্যা তাই নিয়ে কিছুদিন নানা গল্প রটে। তারপরে থিতিয়ে আসে দিন মাস বছর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে।

হরপুর থেকে দেড় বছরের তপতীকে তার মামা কালীমোহন নিয়ে আসেন। সেই সময়ই কালীমোহন বিয়ে করেন ও কালক্রমে সাতটি সন্তানের পিতা হন। তাব বাবা শ্যামাপদ ছোট একটি প্রেসের ম্যানেজার ছিলেন। সঞ্চয় কিছুই ছিল না। একমাত্র ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে পারেননি এবং লেখাপড়ার মাথাও কালীমোহনের ছিল না। বাবার জীবদ্দশাতেই একটি বড় প্রেসে কম্পোজিটার হয়ে কালীমোহন ঢুকে পড়েন এবং বাল্য প্রতিবেশী ও বন্ধু বিমান মৈত্রের মোসাহেবি দ্বারা কিঞ্চিৎ উপরি উপার্জন ও মদ্যপানের অভ্যাস আয়ত্ত করে ফেলেন। অবশ্য তার আগেই নীলিমার বিয়ে দিয়ে ঋণগ্রস্ত শ্যামাপদ সন্ন্যাসরোগে মারা যান। প্রধানতঃ মায়ের পীড়াপীড়ি ও ভাগ্নীকে লালন করার উদ্দেশ্যেই কালীমোহনের বিয়ে করা।

সন্তানসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কালীমোহনের স্ত্রী শোভা পরিবারে অবাঞ্ছিত সদস্য হিসাবে তপতীকে গণ্য করতে শুরু করেন। এই নিয়ে তপতীর দিদিমা ও মামীর মধ্যে প্রবল মনোমালিন্য দেখা দেয়। তপতী কৈশোরে পৌঁছনর পরই দিদিমা ইহলোকের মায়া কাটান; তার ঠাকুরমা ও জেঠিমা এর বহু আগেই হরপুরের বাড়িতে কলেরায় মারা যায়। সরোজবরণ মাসে মাসে টাকা পাঠাতেন তপতীর ভরণপোষণের জন্য। একদিনের জন্যও তিনি মেয়েকে দেখতে আসেননি বা কাছে নিয়ে রাখেননি। তপতীর বয়স হয়েছে তার বিয়ের ব্যবস্থা করুন, এই মর্মে কালীমোহন ওকে একদিন চিঠি দিলেন। জবাবে সরোজবরণ তাকে লিখে পাঠান, 'আপনারাই দেখেশুনে বিয়ের ব্যবস্থা করুন। খরচ বাবদ পাঁচ হাজার টাকা পাঠাব। আমাকে আর এর মধ্যে জড়াবেন না।' ঘটক মারফৎ তপতীর সম্বন্ধ আসে

এবং দশদিনের মধ্যেই বিয়ে হয়। বিমান মৈত্র তখন পুরীতে ছিলেন। ফিরে এসে নিখিলকে দেখার পর বললেন, 'আর একটু ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দিলে পারতে, কালী। টাকার জন্য আটকাতো না, যা দরকার পড়ত আমিই দিতাম। তুমি এত তাড়াহুড়ো যে কেন করতে গেলে। তপুর বয়স মাত্র তো আঠারো এখন।'

আর আমার মেয়ের বয়সই এখন আঠারো! তপতী পানের দোকানের আয়নায় অবাক হয়ে তাকানো নিজের চোখ দুটি দেখে অপ্রতিভ হয়ে গেল। দু' খিলি মিঠে পান কিনে, খানিকটা হেঁটে এসে তপতী মুখে পুরল। দোকানে কয়েকজন খদ্দের দাঁড়িয়ে। তাদের সামনে হাঁ করে মুখে পান দিতে তার অস্বস্তি হয়। রাস্তায় পান কিনে চিবোতে চিবোতে যাওয়া নিখিল পছন্দ করে না। বাড়ি ঢোকার আগে ঠোঁট ঘষে নিতে হবে। কিন্তু এখনই বাড়ি যাওয়ার তাড়া কিসের তার। তপতীর চলন ঢিলে হতে হতে থেমে গেল। নিখিলের ফিরতে নিশ্চয় ঘণ্টাখানেক লাগবে। রুবি নিশ্চয় প্রদীপের কাছে পড়ছে। ননদ ডলি নিশ্চয়ই এখন রান্নাঘরে। শাশুড়ী সম্ভবত শ্রীধরজীর মন্দিরে গিয়ে অন্যান্য বুড়িদের সঙ্গে জমেছে। ছোট জা পূরবী হয় গল্পের বই মুখে নয়তো ঘরে রেডিও খুলে নয়তো সিনেমায়।

তপতী দাঁড়িয়ে ফাঁপরে পড়ল। রুবি এখন অনাত্মীয় একটা ছেলের সঙ্গে। ওকে একা রেখে দেওয়া ঠিক হবে কিনা সে বুঝতে পারছে না। দোতলায় পূরবীরা আছে বটে, কিন্তু কেউ মরে গেলেও উঁকি দেবে না। ডলি ঠিকই নজর রাখবে। স্বভাবটা কুচুটে, সুতরাং নানা ছুতোয় দোতলায় এসে ঘরের সামনে ঘোরাঘুরি করে দেখে যাবে। সেইটাই ভরসা। তবে প্রদীপ ছেলে খারাপ নয়। ভয় রুবিকেই। স্কুলে পড়ার সময় দু-বার গোলমাল পাকিয়েছিল। নিখিলের কাছ থেকে তা লুকিয়ে রাখা হয়েছে। ইদানীং অবশ্য রুবির চালচলনে বয়সের ছাপ পড়েছে, গম্ভীরও হয়েছে। ঘণ্টাখানেক বিনা পাহারায় ছেড়ে রাখলে কি আর এমন ঝঞ্ঝাট পাকাবে! দুবার

হলে, বেঁধে রেখে দিলেও তো হবে। এ ব্যাপার আটকানো যায় না। ডলিকে কি আটকানো গেছল ?

তপতী চলা শুরু করেই সিনেমার বিরাট হোরডিংটা দেখে থমকে পড়ল। আশ্চর্য, এত মিলও হয়! মুখটা ঠিক বিমানমামার মত। একবার বলেছিলেন, 'থিয়েটার তো পাবলিক বোর্ডে করে দেখেছি, সিনেমায় অভিনয় করতে কেমন লাগে একটু দেখার ইচ্ছে আছে।' বলা যায় না, হয়তো বুড়ো বয়সে সত্যিই শখ মেটাতে নেমে পড়েছেন। জেদী আর শৌখিন লোকেরা সব করতে পারে। মুখটা দেখতে দেখতে তার হাসি পেল। বিমানমামা নয়। মাথায় সেই রকমই ধবধবে কোঁকড়া ঘন চুল ঘাড় পর্যন্ত নামা। চৌকো ভারী চোয়াল, চোখদুটো ভেসে রয়েছে নাক থেকে কান পর্যন্ত, বাজপাখির মত নাক, চাহনিতে চাপা বিষণ্ণতা কিন্তু ঠোঁটের কোলে ছেলেমানুষদের মত দুষ্টু দুষ্টু ভাব —বিমানমামার জীবনকাহিনী সিনেমা করলে, এ লোকটাকেই পার্ট দিতে হবে।

একটুখানির জন্য বিমানমামার কাছ থেকে ঘুরে এলে মন্দ হয় না। তপতীর খুব ইচ্ছে করছে এখন, সিনেমা বিজ্ঞাপনের মুখটা এবং তা দেখে যা মনে হল, সেটি ওকে জানিয়ে দেবে। এখান থেকে 'মৈত্র-লজ' মিনিট তিনেকের পথ। গেলেই ভারী গলায় হৈ হৈ করে উঠবেন। মোটা মোটা দেয়ালওলা সেকেলে বাড়ি, কড়িকাঠের কিনারগুলো ক্ষয়ে গেছে। ভয় হয়, ওনার গলার স্বরে বুঝি হুড়মুড়িয়ে পড়বে। রান্নার শখ খুব, হয়তো চাকরকে পাঠাবেন মুরগি কিনতে, নয়তো এসরাজ নিয়ে বসবেন, কিংবা তাসের ম্যাজিক দেখিয়ে যাবেন পরের পর।

॥ দুই ॥

ট্রামরাস্তা থেকে 'মৈত্র-লজ' খানিকটা ভিতরে। রাস্তাটায় দোকান নেই তাই আধ-অন্ধকার। দূরে দূরে কর্পোরেশনের আলো।

রাস্তায় ঢুকলে প্রথমেই পেচ্ছাপের গন্ধ নাকে লাগে। মৈত্র-লজের লোহার ফটকের দু'পাশে দু'টি ইউক্যালিপটাস গাছ। ফটকের কাঠামোটি আছে মাত্র, রেলিং একটিও নেই। এখন এটি বন্ধের বা খোলার দরকার হয় না। ফটক থেকে সুরকির পথ বাঁদিকে বেঁকে গাড়িবারান্দা পর্যন্ত গেছে। ফটকের ডানদিকে একসময় এক বিঘের বাগান ছিল। শরিকদের মধ্যে ভাগাভাগি হওয়ার পর বিমান মৈত্রের ভাগে বাড়ির একটা টুকরো আর দশকাঠা জমি পড়ে। এছাড়া মৈত্রদের কলকাতার কয়েকটি বাড়ি ও অন্যান্য ভূসম্পত্তিরও অংশ পান। শরিকদের অধিকাংশই শুয়ে-বসে দিনযাপন, মামলা-মোকদ্দমা এবং বংশবৃদ্ধি দ্বারা এখন দারিদ্র্যের কবলগ্রস্ত। সম্পত্তি বিক্রয় করে ঠাট বজায় রাখতে রাখতে এখন সম্পত্তির কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই। অবিবাহিত বিমান মৈত্র অবশ্য ঠাটের ধার ধারতেন না। ভাগা-ভাগির পর সম্পত্তি হাতে আসামাত্রই দশ-কাঠা জমিটি বিক্রি করে দেন। শোনা যায়, সেই টাকায় তাঁর দুই রক্ষিতাকে বাড়ি করে দিয়েছেন। অন্যান্য সম্পত্তির অংশ, কোম্পানীর কাগজ ও মায়ের গহনাও একে একে বিক্রি করে দেন উচ্ছৃঙ্খলতার রসদ যোগাতে।

অল্প বয়সেই বিমান মৈত্রের মা মারা যান। তারপরই বাড়িতে তান্ত্রিকদের আনা-গোনা শুরু হয়। ওঁর বাবা সাধন-ভজন নিয়ে এমনই মেতে ওঠেন—একমাত্র ছেলের অস্তিত্বটুকু পর্যন্ত ভুলে বসেন। মাস্টার পড়াচ্ছে, ঝি-চাকররা খাওয়াচ্ছে শোয়াচ্ছে এই জেনেই নিশ্চিন্ত ছিলেন। বাগানের পুব-কিনারের পাঁচিল-ঘেঁষা একতলা ভাড়া বাড়িটির দরিদ্র পরিবারে স্নেহ ভালবাসার লোভে ছেলে যাতায়াত শুরু করেছে সে খবর বহুদিন তাঁর কাছে অজানা ছিল। কালীমোহনের বন্ধু এই রূপবান ফুটফুটে কিশোরটিকে প্রায় বারো বছর মায়ের অভাব বুঝতে দেননি তপতীর দিদিমা। তাঁর কাছে তপতী শুনেছে, কলেজের হয়ে ফুটবল খেলতে গিয়ে একবার বিমানের পা ভেঙে যায়। তখন নীলিমা পনেরো বছরের। বগলে লাঠি দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসতেন নীলিমাকে পড়াতে। একই

বানান বারবার ভুল লেখার জন্য কান মুলে দিয়েছিলেন, তাইতে নীলিমা জলগ্রহণও বন্ধ করে দেয়। সাধাসাধি করেও টলানো গেল না। দু-দিন এইভাবে কাটল। বিমান তখন একটা হাতুড়ি এনে বললেন, 'তিন পর্যন্ত গুনব, যদি এর মধ্যে কেউ একজন ভাত মুখে দেয় তো ভাল, নয়তো পিটিয়ে পিটিয়ে প্লাস্টার ভেঙে পা-টাকে চিরকালের মত খোঁড়া করে দেব।' হৈ হৈ পড়ে গেল বাড়িতে। এ বলে খাব না, ও বলে খোঁড়া হব। হাতুড়িটা ঠকাস করে শক্ত প্লাস্টারের উপর মেরে বিমান বললেন—এক, নীলিমা তবু অটল। তারপর আরো জোরে মেরে—দুই। তখন নীলিমা ছুটে ছাদে উঠে গেল। পাঁচিল নেই ছাদে, কিনারে দাঁড়িয়ে বলল, কেউ যদি পা ভাঙে তো লাফ দিয়ে আমিও পা ভাঙব।

এই পর্যন্ত বলে হাসতে হাসতে দিদিমার ছানিপড়া চোখে জল বেরিয়ে আসে। ব্যগ্র হয়ে তপতী শুধিয়েছিল, "তারপর কি হল?" দিদিমা জল মুছতে মুছতে বলে, "তারপর আর কি, মিটে গেল দুজনের ঝগড়া। অসম্ভব জেদী ছিল তোর মা। বিমান হেরে যেত ওর কাছে। বরাবরই হারতো! শুধু একবারই—" হঠাৎ থেমে গেল বৃদ্ধা। তপতীর হাজার অনুরোধেও আর মুখ খোলেনি।

নীলিমার মত তখন তারও পনেরো বছর বয়স। পরপর কয়েকদিন সে এক কাল্পনিক কিশোরের সঙ্গে এইরকম মান অভিমানের পালা চালিয়েছিল। কিন্তু কিশোরটিকে হুবহু বিমানমামার মতই দেখতে হয়ে যাচ্ছিল। অপর কোন কিশোর মূর্তি তার কল্পনায় এল না।

'মৈত্র লজে'র ফটকে প্রতিবার পা দিয়েই তপতী অযথা অদ্ভুত এক চাঞ্চল্য বোধ করে। ইচ্ছে করে কৈশোরে ফিরে যেতে। এবং যদি কোন মন্ত্রবলে যেতে পারেও তাহলে কোন এক কিশোর মূর্তি কল্পনা করতে হলে বিমানমামার সাদৃশ্যেই করবে। অথচ কিশোর বিমান মৈত্রকে সে দেখেনি। প্রথম দেখে ওঁর প্রায় বত্রিশ বছর বয়সে। দেখে মনে হয়েছিল রাজপুত্তুর। অনেকবার সে বিমানমামার দিকে তাকিয়ে থেকে ওঁর চুলগুলোকে কালো করে, ত্বকের বলিচিহ্ন

মিলিয়ে দিয়ে, কণ্ঠস্বরকে লঘু করে খুঁজেছে সেই কিশোরকে। ওঁর কৈশোর বা যৌবনের প্রসঙ্গ তুলে আলাপ ফেঁদেছে। কিন্তু সেই বিমান মৈত্র ধরা পড়েনি। বরং পূর্বপুরুষদের প্রতাপ আর বড়মানুষির গল্প করতেই যেন উনি ভালবাসেন। 'ওদের রক্তই তো শরীরে বইছে। আমিই বা ব্যতিক্রম হব কেন! অহঙ্কার আর জেদ আমাদের বংশের চরিত্র। এর জন্যই তো সব হারালাম। নিজেকেও মেরে ফেললাম। এখন যাকে দেখছিস সে তো একটা মরা মানুষ।' বলতে বলতে বিমানমামা অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন, সামলে নিয়ে হেসে বলেছিলেন—'লোকে একটু বাড়িয়ে আমার চরিত্রের দোষ ধরে। অন্যায়ভাবে দু'হাতে টাকা উড়িয়েছি ঠিকই, কিন্তু কোনদিন মিথ্যে কথা বলিনি, জোচ্চুরি করিনি, কারুর অনিষ্ট চিন্তাও কখনো মনে স্থান দিইনি, গোপন করার মতন কোন ব্যাপারও—' হঠাৎ থেমে গিয়ে, তপতীকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে মুখ টিপে হেসে বলেন, 'কিছু কিছু নিশ্চয় আছে। সব মানুষেরই থাকে, তোরও কি নেই!'

'মোটেই না। আমার গোপন ব্যাপার বলে কিছু নেই।' তপতী বেশ ঘাবড়ে গিয়েই প্রতিবাদ করেছিল। খারাপ ব্যাপারই গোপনে রাখতে হয়। বিমানমামার কি ধারণা সে কোন খারাপ ব্যাপারে লিপ্ত!

'কিছুই নেই!' বিমানমামা খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, 'থাকলে ভাল হতো। এমন একটা সময় হয়তো আসবে জীবনে যখন সম্বল বলতে থাকবে শুধু কোন একটা স্মৃতি। কাউকে বলা যায় না এমন কোন কথা। দুঃখের বা সুখের। গাছের মত ডালপালা মেলে ছড়িয়ে থাকবে মনের মধ্যে। নিঃসঙ্গ হয়ে এলে তখন তার ছায়ায় বসে থাকা। তখন অন্য আর কিছুতেই আনন্দ পাওয়া যায় না।' সুখ বলতে গিয়ে থেমে উনি আনন্দ শব্দটি ব্যবহার করেন।

'তাহলে তো গোপন কিছু ব্যাপার ঘটিয়ে ফেলতেই হয়।

নয়তো নিরানন্দে জীবন কাটবে।' চোখেমুখে কৃত্রিম ভয় ফুটিয়ে তপতী বলেছিল। বিমানমামা জোরে হেসে ওঠেন। 'নিরানন্দের বয়সে পৌঁছতে তোর অনেক দেরি। তাছাড়া সংসার আছে, কত অজস্র ভাবে সময় কাটাতে পারবি। আমার কেউ নেই বলেই তো সময় কাটতে চায় না। ভোরে ঘুম ভাঙলেই ভয় করে, দিনটা কাটাবো কি করে। ভয়ে ভয়েই দিন কাবার হয়ে যায়।' তপতী বলেছিল, 'কেন, গোপন স্মৃতির গাছের ছায়ায় বসে ঢুলতে ঢুলতে দিন কাটাবেন।' বিমানমামার হাসিটা তাইতে দপ করে নিভে গেছল। তপতী শুধু অপ্রতিভই নয়, কষ্টও বোধ করেছিল সেই মুহূর্তে। পরিহাস করতে সে চায়নি।

"কাকে চাই?"

তপতী চমকে ফটকের এপাশ ওপাশ তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। ডানদিকে চারতলা নতুন ফ্ল্যাটবাড়ির পিছনের দেয়াল। বিমান মৈত্রের ভাগেপড়া বাগানের অংশ এইটাই ছিল। অন্য শরিকদের অংশে মোটর মেরামত কারখানা, সরষে তেলের ঘানি আর কয়লার দোকান হয়েছে। অতিকায় প্রাচীন একটা জন্তুর মত মৈত্র লজের সঙ্গে গা লাগিয়ে থাকতে হচ্ছে বলে ঝকঝকে ফ্ল্যাটবাড়িটাকে খুবই বিরক্ত দেখায়। পারলে যেন এখুনি স্থানত্যাগে রাজী। ফটকের বাঁদিকে গাড়িবারান্দা পর্যন্ত সুরকির পথটা রাস্তার আলো থেকে অর্ধেক পর্যন্ত ঠাওর করা যাচ্ছে। গাড়িবারান্দার তলায় আগে একটা আলো জ্বালতেন বিমানমামা। পরপর চারটি বালব চুরি যাওয়ায় হাল ছেড়ে দিয়েছেন। ওঁর ধারণা, ভাড়াটেদের ছেলেটিই চুরি করেছে। বসত অংশের একতলাটা ভাড়া দিয়েছেন। রাস্তার উপরের দু'টি ঘরে এক কার্ডবোর্ড কোম্পানি তাদের বাক্স রাখে। ভিতরের দিকের দু'টি ঘরে আছে এক পরিবার। ওদের যাতায়াতের দরজাও রাস্তার উপর। তবে তপতী ভাড়াটে বৌটিকে দু'তিনবার দেখেছে। হরদম চীৎকার করে ছেলেমেয়ে এবং স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে। বিরক্ত হয়ে বিমানমামা উঠে যেতে বলায়

ভাড়াটেদের ছেলেটি বোমা মারবে বলে শাষিয়েছে। একবার ছেলেটি জেল খেটে এসেছে চোলাই মদ পাচার করতে ধরা পড়ে। বছর দুয়েক ওরা ভাড়া দিচ্ছে না। ওদের বিরুদ্ধে মামলা করবেন, একবার বিমানমামা বলেছিলেন। হয়তো করেছেনও। অনেকদিন তপতী আসেনি। প্রায়, চার মাস।

"এই যে এদিকে।"

একটি ছেলে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল। বয়স বড়জোর কুড়ি। পরনে ঠেঁঠো আঁটসাট কালো প্যাণ্ট আর নাইলনের সবুজ স্পোর্টস গেঞ্জি। রোগা হিলহিলে। কদম ছাঁট চুল। হাত দুটো সরু কিন্তু কব্জির হাড় চওড়া। কনুই থেকে দড়ির মত শিরা পুরো বাহুতে জড়ানো। তোবড়ানো গালদুটোর নীচে চওড়া হনু এবং কোটরে ঢোকা চোখ মুখখানাকে ভোঁতা এবং হিংস্র করে রেখেছে।

"কোথায় যাবেন ?"

"কেন ?" তপতী বিরক্ত হয়ে বলল।

"দরকার আছে।"

রুক্ষ এবং কর্তৃত্বব্যঞ্জক স্বরে তপতী আশ্চর্য বোধ করল। বহুবার এসেছে কিন্তু এরকম ব্যাপার আগে কখনো ঘটেনি। ফটক বা এই পথটা এজমালি। সে কোথায় যাবে, তা জানার প্রয়োজন কারোরই থাকার কথা নয়।

"বিমান মৈত্র আমার মামা হন, তাঁর কাছে যাচ্ছি।"

"ভাগ্নী !" ছেলেটি পা ফাঁক করে কোমরে হাত দিয়ে তপতীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "তার মানে ? ওঁর তো বোনটোন কেউ নেই।"

"তুমি কে, এত যে জেরা করছ ?" তপতী রুক্ষ হবার চেষ্টা করল।

"ওনার এখন সিরিয়াস অসুখ। বাইরের লোকের যাওয়া বারণ।"

"সে কি ! কবে থেকে, কি অসুখ হয়েছে ?" তপতী ভোঁতা

হিংস্র মুখটার উপর ব্যগ্র চোখ রাখল।

"স্ট্রোক হয়েছে। হাই ব্লাডপ্রেশার ছিল।"

তপতী এগিয়ে যাচ্ছিল, ছেলেটি দু'হাত বিস্তার করে বলল, "যাওয়া বারণ।"

"আমি বাইরের লোক নই।"

"কার্তিকদা বলেছে, এ বাড়িতে যারা থাকে, তারা ছাড়া ওঁর আর কোন আত্মীয়-ফাত্মীয় নেই।"

"তোমায় এ কাজের দায়িত্ব কে দিয়েছে ?"

"কার্তিকদাকে চেনেন, ওই বাড়িতে থাকে ?" ছেলেটি আঙুল তুলে দেখাল। ওই দিকটায় বিমান মৈত্রের জ্ঞাতি-ভাইয়েদের অংশ। ওদের সঙ্গে মনোমালিন্য দু' পুরুষ ধরে। তবে সামাজিকতায় কখনো ছেদ পড়েনি, দেখা হলে হেসে কুশল বিনিময়ও কোনদিন বন্ধ থাকেনি। শেয়ার বাজারে বছর তিরিশ আগে সর্বস্বান্ত হয়ে মৈত্র লজের এই শরিকরা আর মাথা তুলতে পারেনি। এখন কেউ সামান্য চাকুরি কেউ দালাল কেউ বা মনোহারি দোকান খুলে বসেছে।

"তিনি আমার পথ আটকাবেন কোন অধিকারে !"

"কার্তিকদাই বুড়োর ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করেছে, দেখাশোনাও করছে। অধিকার ওর থাকবে না তো কি আপনার থাকবে ?"

ছেলেটির কথাবলার চোয়াড়ে ভঙ্গিতে তপতীর সর্বাঙ্গ জ্বালা করে উঠল। গলা চড়িয়ে সে বলল, "আছে কি নেই, সেটা পরে দেখা যাবে, এখন পথ ছাড়বে কিনা বলো।"

ছেলেটি দুহাত প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে, পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ল ভারিক্কি চালে। এমন সময় একতলার একটা অন্ধকার জানালায় আলো জ্বলে উঠল। একটি স্ত্রীলোক চাপা স্বরে বলল, "কার্তিকবাবুকে ডাক-না বাবলু। তুই কেন আবার ঝঞ্ঝাট পাকাচ্ছিস।"

বাবলু বিরক্ত হল এই পরামর্শে। ধমক দিয়ে বলল, "আমি

যা-ই করি না কেন, তাতে তোমায় নাক গলাতে হবে না। কার্তিকদা সেদিন কি বলল মনে নেই? আত্মীয় সেজে এখন অনেকেই আসবে, বুড়োর বাড়ি রয়েছে না?"

"তোর যা ইচ্ছে কর।"

হতাশ বাবলুর মা জানালা থেকে সরে গেল। বাবলুর শেষ কথাটির ইঙ্গিত বুঝতে তপতীর অসুবিধে হল না। মনে মনে কুঁকড়ে গেল সে। এখানে তার আসার অর্থ এইভাবে ধরা হবে, স্বপ্নেও সে ভাবতে পারত না। প্রথমেই তার এ জায়গা থেকে ফিরে যাবার কথা মনে হল। কিন্তু বিমানমামার স্ট্রোক হয়েছে, একা বুড়ো মানুষ, ফেলে রেখে কি করেই বা চলে যাওয়া যায়, এ কথা শোনার পর!

"আমি ওঁর বাড়ি পাওয়ার লোভে আসিনি। ওঁর সঙ্গে আমার কোন রক্তের সম্পর্কই নেই, বাড়ির দাবিও আমি করতে পারি না। ছোট থেকেই ওঁকে চিনি, আমার মামার বন্ধু হন। আমি তো কতবার এসেছি এখানে।" তপতীর স্বর শেষ দিকে ব্যাকুল হয়ে উঠল। "এমন হয়েছে জানলে আমিই চিকিৎসার ব্যবস্থা করতাম।"

বাবলু যেন থিতিয়ে এল। ওর দাঁড়াবার ভঙ্গি নরম হতে শুরু করেছে। "দেখুন—" বলে কথা শুরু করতে যাচ্ছিল, সেই সময়ই গাড়িবারান্দার তলার অন্ধকার থেকে কে বলে উঠল, "কি ব্যাপার, বাবলু কার সঙ্গে কথা বলছিস?"

"কার্তিকদা, একবার আসুন তো এদিকে।"

বাবলুর সঙ্গে তপতীও অন্ধকারের দিকে তাকাল। মাত্রাতিরিক্ত ফর্সা, হ্রস্বাকৃতি, নাদুস-নুদুস একটি লোক এগিয়ে এল। পরনে ধুতির সঙ্গে সার্ট। ইস্ত্রির ভাঁজ অটুট, কিন্তু ময়লা। দুটি গাল মেয়েদের মত কোমল এবং নির্লোম। ঠোঁট দুটি পাতলা। বিমান মৈত্রের মত পুরুষালি তীক্ষ্ণতা দেহের কোথাও নেই, তবে নাক এবং চোখ দেখলে বোঝা যায় মৈত্র বংশেরই কেউ।

"দেখুন তো, বলছে ভাগ্নী হয় আপনার বিমানদার!"

বাবলু এক-পা পিছিয়ে ব্যাপারটা নবাগতের দায়িত্বে ছেড়ে দিল।

"আবার নাকি স্ট্রোক হয়েছে বিমানমামার?"

তপতীর উৎকণ্ঠা দেহভঙ্গির সঙ্গে গলার স্বরেও ফুটে উঠল। কার্তিকের চোখের বিস্ময় রূপ নিল সন্দেহের। কি যেন সে হিসেব করে নিল মনে মনে।

"ওঃ আপনিই সেই ভাগ্নী, মাঝে মাঝে বিমানদার কাছে যিনি আসেন?"

"হ্যাঁ, আমিই।" তপতীর উৎকণ্ঠা অসহায় আবেদন হয়ে বেরিয়ে এল, "ওঁকে একটু দেখতে চাই, দেখা যাবে না?"

"ডাক্তারের একদম বারণ।"

"কথা বলব না। দূর থেকেই দেখব। বড় ঘরেই তো আছেন, দালানের জানালা থেকেই দেখব।"

"কি আর দেখবেন।" কার্তিকের মিহিগলা ব্যথিত রূপ নিল। ওর উচ্চারণ কাটাকাটা এবং স্পষ্ট। কথা বলার সময় ঠোঁট দুটি প্রায় স্থিরই থাকে। "একইভাবে আজ চারদিন রয়েছেন। চিকিৎসা করার তো কিছু নেই, নইলে চেষ্টা করা যেত। তবু দুবেলাই ডাক্তার আনাচ্ছি। বয়সও তো কম হল না। নেহাত অমন একটা স্বাস্থ্য ছিল বলেই তিনটে স্ট্রোক সহ্য করেছেন। কম অত্যাচার তো শরীরকে দেননি।"

কার্তিক মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল তপতীর মুখের দিকে। তপতীর নে হল, ওর চোখ তাকে অপছন্দ করছে, বিরক্তবোধ করছে। সমায়িক ভঙ্গিতে মাঝে মাঝে কঠোরতা এসে পড়ছে। যদি বমানমামাকে দেখতে যেতে না দেয়, তাহলে কিছুই করার নেই। চঁচামেচি করলে লোক জড়ো হবে। তারা কার্তিকের পক্ষেই সায়

মাম

ামি শুধু ওর মুখটুক দেখেই চলে যাব।"

হলে আসুন। কিন্তু এক মিনিট, তার বেশি নয়।"

দঃ৩

কার্তিকের পিছনে তপতী গাড়িবারান্দার দিকে এগোল। পা টিপে তারা সিঁড়ি দিয়ে উঠল। দোতলার দালানে পৌঁছে ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে কার্তিক নীরব থাকার নির্দেশ দিল।

তপতী ঘাড় নাড়ল। আঙুল দিয়ে কার্তিক বড় ঘরের জানালাটি দেখাল। তপতী এগিয়ে এসে ঘরের মধ্যে তাকাল।

জানালার দিকে মাথা করে শুয়ে। মুখটির কিছুই দেখা যাচ্ছে না যেহেতু বালিশে মাথাটি উঁচু হয়ে রয়েছে। সাদা রেশমের মত ঘন চুলের কয়েকটা পাখার হাওয়ায় থরথর কাঁপছে। ওই চুলের মধ্যে আঙুল ডোবালে কেমন লাগে সেটা জানার ইচ্ছে তপতীর বহুদিনের। একবার বলেও ফেলেছিল। শোনামাত্র হাত দুটো দেহের দুপাশে প্রসারিত করে হাসতে হাসতে ছ' ফুটেরও বেশী দেহটা নুইয়ে দিয়েছিলেন, বিশাল কাঁধটার দিকে তাকিয়ে তপতী ভয়ে পিছিয়ে যায়। হেলে পড়া একটা প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের মত মনে হয়েছিল তার। সশব্দে মাটিতে আছড়ে পড়বে। কিন্তু এখন যেন সে গাছটাকে সত্যিই পড়ে থাকতে দেখছে। এত বড় একটা দেহকে নিঃসাড়ে শয়ান থাকতে আগে কখনো সে দেখেনি। সাদা চাদরে আবৃত বুক ওঠানামা করছে কিনা বোঝা যায় না। পূর্ব-পুরুষদের কয়েকটি অয়েলপেন্টিং-এর ওপর পাখার ছায়াটা দপদপ করছে। শ্বেত পাথরের টেবিলের ওপর এসরাজটি রাখা। ওটি দেয়ালে টাঙান থাকে, স্ট্রোক হবার সময় হয়তো বাজাচ্ছিলেন। হাত থেকে পড়ে গেছল, পরে কেউ টেবিলে তুলে রেখেছে। ওষুধের শিশি এসরাজের পাশে। আলনায় কয়েকটা ময়লা ধুতি। দেয়াল-ঘড়ির টকটক শব্দ পর্যন্ত তপতী শুনতে পেল। তার মনে হল, খুব শীঘ্রই মৃত্যু এখানে আসবে।

চমকে ফিরে দাঁড়াল সে। কার্তিক বাহুতে টোকা দিয়েছে। ইশারায় সিঁড়ি দেখিয়ে মাথা হেলাল। আসার মত ফিরে যাওয়ার সময়ও ওরা পা টিপে নামল।

নাক

"বিমানদার সঙ্গে সঙ্গেই হেমাঙ্গপ্রসাদের বংশ শেষ হবে।" সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে কার্তিকের বিষণ্ণ স্বর শোনা

শুনতে পেল পিছন থেকে।

"বিয়ে করলেন না, কে জানে কেন। আমার বাবা, মা, কাকারা, জ্যাঠারা কত বলেছিলেন, অন্তত বংশ রক্ষার জন্যও বিয়ে করতে। কিন্তু কি যে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নিলেন। সম্পত্তি ওড়ালেন খ্যাপার মত। কম ছিল না টাকা! বরাবরই ওঁদের এক ছেলের বংশ, সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়নি তিন পুরুষ।"

সুরকির রাস্তা পেরিয়ে ওরা ফটকে পৌঁছল। রাস্তার আলোয় তপতী দেখল কার্তিকের মাথার মাঝখানে পাতলা টাক, চুল টেনে এনে ঢাকা দেওয়া। নিখিলও অনেকটা এই রকম করেই আঁচড়ায়।

"আমরা তো ভেবেছিলাম, এই বাড়িটাও নষ্ট করে যাবেন। ওঁর হাতে যা টাকা ছিল তার কিছুই আর নেই। চিকিৎসার খরচ আমাকেই করতে হচ্ছে। অথচ দেখুন, এককালে ওঁদের সঙ্গে আমাদের দেওয়ানী-ফৌজদারী নিত্যি লেগেই ছিল। তবু এই অবস্থায় পুরনো কথা মনে করে ওঁকে তো আর ফেলে দিতে পারি না। হাজার দোষ ওঁনার থাকুক মৈত্র-বংশের রক্ত তো শরীরে বইছে। আপনাকে কি রিক্সা ডেকে দেব?"

তপতী 'না' বলতে গিয়েও পারল না। ঝপ করে তার দেহের উপর ক্লান্তি যেন চেপে বসল। লোকটার একঘেয়ে মিহি সুরে নিজের পিঠ নিজে চাপড়ানোর শব্দটা এখন একদম ভাল লাগছে না তপতীর। ঘণ্টা চারেক হল বাড়ির বাইরে রয়েছে। নিখিল যদি ইতিমধ্যে ফিরে থাকে তাহলে বিরক্তি প্রকাশ করবে এতক্ষণ একা বাইরে থাকার জন্য। বিমানমামার কাছে আসা নিখিল ভীষণ অপছন্দ করে। যদি না ফিরে থাকে তাহলে না বললেও চলে কোথায় গিয়েছিলাম।

এইসব ভেবে তপতী একটি রিক্সায় উঠল এবং সারাপথ বিমান-মামার শায়িত বিরাট দেহটির কথাই ভাবল।

॥ তিন ॥

ক্লান্তি নিয়ে তপতী বাড়ির সদরে পা দিল। ষাট টাকায় তিনতলা গোটা বাড়ি এক সময় ভাড়া পাওয়া যেত কলকাতায়। সেই আমলে নেওয়া এই বাড়িটির ভাড়া এখন নব্বুই। একতলায় সদরের গায়েই একটি ঘর। তাতে থাকে তপতীর শাশুড়ী প্রতিভা আর ননদ ডলি বা প্রমীলা। আট বছর আগে, বিয়ের তিনমাস পরই ডলি স্বামী-গৃহ থেকে প্রায় একবস্ত্রেই চলে আসে প্রত্যাবর্তনের কোনরকম ইচ্ছা না নিয়েই।

ঘরের লাগোয়া উঠোনকে দু'দিকে বেষ্টন করে রোয়াক। কলঘর এবং রান্নাঘর তার উল্টোদিকে। দোতলায় ওঠার সিঁড়ি ডলিদের ঘরের পাশ দিয়ে। ওঠার সময় ঘরের কিছুটা অংশ দেখা যায়, ঘরের লোকও সিঁড়ি ভেঙে ওঠা দেখতে পায়। রিক্সার শব্দেই রাস্তার দিকের জানালায় ডলি উঁকি দিয়েছিল। তপতী যখন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে যাচ্ছে, ডলি ডাকল।

"একটা কথা বলি বৌদি, রুবিকে কিন্তু এখন থেকে একটু চোখে চোখে রেখো," গলা নামিয়ে ফিসফিসিয়ে ডলি বলল।

"কেন, কি হল ?" তপতীর বুকের মধ্যে ধ্বক্ করে উঠল।

"তোমরা বেরিয়ে যাবার পরই প্রদীপ এল। রুবি সেজেগুজে ওর সঙ্গে বেরোল। যাবার সময় ঘরের চাবিটা আমায় দিয়ে বলে গেল—এখুনি আসছি। আটটা তো বাজতে চলল, অথচ এখনো আসেনি।"

"কোথায় যাচ্ছে বলে যায়নি ?"

"কিচ্ছু না। আমার যেন মনে হল, আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। তোমরা বেরোলে আর অমনি প্রদীপও হাজির।"

ডলির হাত থেকে চাবি নিয়ে উঠতে যাচ্ছে তপতী, থেমে পড়ল

আবার ডলির কথায়।

"একবার তো কাণ্ড করেছিল, আর যেন না করে।"

শোনা মাত্র তপতীর মাথার মধ্যে চিড়বিড় করে উঠল। বলার ভঙ্গিটা হিতৈষীর মত বলেই বোধ হয় তার অসহ্য ঠেকল।

"কি করে না করে সে আমি বুঝব, তোমায় তাই নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। তুমি বরং নিজের কথাই ভাব।"

ডলির ফর্সা মুখ আর একটু সাদা হয়ে গেল এই শুনে। সামলে নিয়ে বলল, "তাই তো ভাবি দিনরাত। কবে যে রেহাই পাব এ সংসার থেকে। গত জন্মে কত যে পাপ করেছিলাম!"

"গত জন্মে কেন, এ জন্মেই। এর মধ্যেই ভুলে গেলে নাকি?"

ডলি রাগ চেপে মুখ লাল করে ঘরে ঢুকে গেল। আর তপতী পদক্ষেপে রাগ প্রকাশ করতে করতে দোতলায় উঠল। তার রাগ ডলির উপর নয়। এভাবে বাড়ি থেকে রুবির বেরোনটা সে বরদাস্ত করতে পারছে না। তিন বছর আগে ওর স্কুলের পাড়ায় দু'দল ছেলের মধ্যে প্রচণ্ড মারামারি হয়েছিল এবং যে ছেলেটির মুখ অ্যাসিড বালবে ঝলসে যায় তার এবং রুবির একত্র তোলা ছবি আর গোটা পাঁচেক চিঠি, ডলিরই সংবাদ সূত্রে, তপতী আবিষ্কার করে রুবির একটি খাতার মধ্যে থেকে। ছবিতে দেখা যায় রুবি তার মায়ের সিল্কের শাড়ি পরে ঘোমটা দিয়ে সলজ্জ দৃষ্টিতে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে। দেখে তপতী লজ্জিত হয়েছিল। নিখিল জানলে কি কাণ্ড ঘটবে, তাই ভেবে ভয়ও পেয়েছিল। রুবিরই ক্লাসের একটি মেয়ের কাছ থেকে ডলি আরও জানতে পারে, রুবির প্রণয়প্রার্থীদের সংখ্যা জনাচারেক। তাদের দলের মধ্যে মারামারি সীমাবদ্ধ থাকলেও তার ঢেউ স্কুলেও লেগেছে। হেডমিস্ট্রেস নাকি বলেছেন, রুবির মত মেয়েকে আর স্কুলে রাখবেন না। শুনেই তপতী ছুটে যায়। হেডমিস্ট্রেসের প্রায় হাতে পায়ে ধরেই অ্যানুয়াল পরীক্ষা পর্যন্ত রুবিকে রাখতে রাজী করায়। এরপর থেকে নিখিল অফিসে বেরিয়ে যাবার পর রুবিকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসা এবং নিয়ে

আসার কাজে তপতী বছরের বাকি দিনগুলোয় একদিনের জন্যও গাফিলতি করেনি। প্রচণ্ড প্রহারের ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু লোক জানাজানি, বিশেষত পাশের ঘরের পূরবী জেনে ফেলবে, এই ভয়ে তপতী চাপা গর্জন ছাড়া আর কিছু করতে পারেনি। তবে বাড়ি থেকে রুবির একা বেরোন বন্ধ হয় তখনই। এখন মরনিং কলেজে রুবি একাই অবশ্য যাতায়াত করছে। বড় হয়েছে, অতএব এখুনি বিয়ে না দিয়ে ওকে কলেজে পড়ানোয় তপতীর আপত্তি নিখিল অগ্রাহ্য করে দেয় এই বলে, "আজকাল শুধু টাকা দিয়েই ভাল জামাই পাওয়া যায় না, শুধু সুন্দরী মেয়ে দিয়েও নয়। এখন কদর শিক্ষিত ভাল মেয়ের। কিন্তু আসল কারণটা জানলে নিখিল কি যে করবে ভেবে তপতী আজও শিউরে ওঠে। এ বাড়িতে ডলি ছাড়া ঘটনাটি আর কেউ জানে না। ডলির ঘটনাও তপতী জানে তাই সে নিশ্চিন্ত, ডলির দ্বারা চাউর হবে না।

দোতলায় পৌঁছেই তপতী বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখল, পূরবীর ঘরে তালা। হয় বাপের বাড়ি কিংবা সিনেমায় গেছে। নিজের ঘরের তালা খুলতে গিয়ে কি ভেবে তপতী পাশের ছোট ঘরের তালা খুলে ঢুকল। এ-ঘরে রুবি থাকে। আলো জ্বেলে ঘরের প্রতিটি জিনিসের উপর সন্তর্পণে চোখ বুলিয়ে পা টিপে টিপে সে টেবিলের ধারে এল। বইগুলো দেয়ালে ঠেস দিয়ে সাজিয়ে রাখা। একটি একটি করে সে প্রত্যেকটি খুলে দেখে রেখে দিল। খাটের তোষক উলটে দেখল। খাতার পাতা ওলটাতে ওলটাতে হঠাৎ একটা পাতায় চোখ আটকে গেল। সারা পাতা জুড়ে শুধু 'প্রদীপ' শব্দটি লেখা। হাতের লেখা তপতী চিনল। পরের পাতা জুড়ে 'অসভ্য' শব্দটি। তার পরের পাতায় 'আড়ি'।

সদরে কড়া নাড়ার শব্দ হল।

তপতী খাতাটা দ্রুত যথাস্থানে রেখে দোতলার দালানের রেলিংয়ে এসে ঝুঁকে উঠোনে চোখ রাখল। ডলি সদর দরজা খুলে দিল। রুবি আর প্রদীপ। তপতী শুনল প্রদীপ বলছে, "আমার আর

ওপরে যাবার দরকার কি।" রুবি আদুরে গলায় বলল, "বাব্বা, খালি বাড়ি ফেরার তাড়া। এখুনি গিয়ে করবেন কি?" ওপর দিকে তাকিয়ে ঘরে আলো জ্বলছে দেখে গলার স্বর পালটে বলল, "একা দেখলে মা বকবে, আপনি একবার অন্তত দেখা দিয়ে যান।"

তপতী বারান্দা থেকে সরে ঘরের মধ্যে এল। এখন কি বলবে বা করবে ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারছে না সে, মাথার মধ্যে দপদপ করছে শুধু চিৎকার করার ইচ্ছা, যেটা সিঁড়ি দিয়ে দুজনের ওঠার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তার আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে।

"মা, জানো কোথায় গেছলাম আজ!" রুবি ঘরে ঢোকার আগেই বলতে শুরু করল। "প্রদীপদা-দের বাড়ি। জেঠিমা যা হেভি খাইয়ে দিলেন, রাতে আর—" থেমে গেল রুবি। থমথমে মুখ তপতীর। এই চেহারাটা তার চেনা। ঘাড় ফিরিয়ে সে প্রদীপের দিকে তাকাল। এখন চটপট প্রদীপের এখান থেকে চলে যাওয়া দরকার, নয়তো প্রচুর রূঢ় কথা শুনতে হবে।

"আচ্ছা প্রদীপদা, আপনি এবার তাহলে—"

"না, যাবে না।" তপতীর গম্ভীর স্বর সন্ত্রস্ত করল দুজনকেই। "এ তোমার কেমন শিক্ষা প্রদীপ? অতবড় মেয়েকে তুমি তার বাপ-মার বিনা অনুমতিতে বাড়ির বাইরে নিয়ে গেলে কোন সাহসে?"

"আমি তো নিজেই গেছি।" রুবি দোষটা নিজের ঘাড়ে নেবার চেষ্টায় তপতী বাধা দিল।

"না। তুমি নিজে যাওনি। তোমার সবকিছু বুঝে চলার বয়স হয়নি। কিন্তু প্রদীপ, তুমি শিক্ষিত, চাকরি করছ, একটা সংসারের মাথা, তোমার তো বোঝা উচিত, এভাবে লুকিয়ে একটা মেয়েকে নিয়ে বেরোলে লোকে কি ভাববে, কি বলবে?"

"লুকিয়ে তো বেরোইনি।" প্রদীপ কিছু একটা বলার যৎসামান্য চেষ্টা করল।

"তবে কি ভাবে বেরিয়েছ? আমাকে বা তোমার কাকাবাবুকে কি বলেছিলে? অথচ আগে থেকেই তোমাদের ঠিক ছিল। এইসব

গোপনীয়তা কেন, কিসের জন্য ? তাছাড়া রুবির বিয়ের চেষ্টা হচ্ছে, এইসব ব্যাপার তাতে ক্ষতিই করবে।"

শেষ বাক্যটি বলে তপতীর মনে হল, একটু-আধটু মিথ্যা না বললে কোন ব্যাপারই গুরুতর করে তোলা যায় না। কতদূর গড়িয়েছে কে জানে, তবে আর ওদের গড়াতে দেওয়া যায় না। রুবি ঘরে ঢোকামাত্র সেণ্টের গন্ধ সে পেয়েছে। পূরবীর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছে, না নিজেই কিনেছে, না প্রদীপ উপহার দিয়েছে, এই সমস্যাটা এখন তপতীর ভাবনায় ভেসে এল। প্রদীপ যদি কায়স্থ হতো, যদি অতবড় সংসারের বোঝা সামান্য মাইনের টাকায় বইবার দায় ঘাড়ে না থাকত, তাহলে এই ভাবনাটা হতো না। ছেলেটি ভাল।

"আমি এসব জানতাম না। আমার অন্যায় হয়েছে কাকীমা।" প্রদীপ অদ্ভুত স্বরে বিস্ময় এবং অনুতাপ প্রকাশ করে রুবির দিকে একবার তাকিয়েই দ্রুত বেরিয়ে গেল। তপতী নরম হয়ে গেল। ছেলেটি যে ভাল তাতে সন্দেহ নেই। রুবিই বোধহয় ওর মাথা খেয়েছে।

"কে বলল আমার বিয়ের চেষ্টা হচ্ছে ? কেন মিথ্যা কথাটা বললে। কেন, কেন ?" রুবি ঠকঠক করে কেঁপে উঠল। তপতীর মনে হল দরজার পাশে কেউ দাঁড়িয়ে। নিশ্চয় ডলি। ওর আড়িপাতা অভ্যাস আছে। উঠে গিয়ে হাতেনাতে ধরে ফেলবে কিনা, তপতী ভাবল।

"প্রদীপদা বলেছিল, তোমার পারমিশান না পেলে আমায় নিয়ে যাবে না। আমি বলেছি, হ্যাঁ নিয়েছি। আমারই দোষ। আর তুমি যাচ্ছেতাই করলে ওকে। তুমি ওর কাছে আমায় মিথ্যেবাদী করে দিলে। আর আসবে না আমাদের বাড়ি। এই অপমানের পর, আমি জানি আর আসবে না।"

"না আসে তো কি হয়েছে! তোমাদের সম্পর্ক মাস্টার আর ছাত্রীর। আমি লক্ষ্য করছি তোমরা সে সম্পর্ক ছাড়িয়ে যাচ্ছ। দ্যাখো রুবি, আমি চাই না তোমার বাবার মাথা হেঁট হয় এমন কোন

কাজ হোক। একবার করেছিলে মনে নেই ? বস্তির একটা গুণ্ডা ছেলের সঙ্গে, ছি ছি ছি, প্রবৃত্তি হয় কি করে, যদি গুণ্ডাগুলো এসে বাড়ি চড়াও করত, যদি পুলিশ আসত ?" তপতী লক্ষ্য করল শুনতে শুনতে রুবি ঝিমিয়ে পড়ছে। একটু আগেই যে ভাবে ফোঁস করে উঠেছিল, তাতে পরিবারের মর্যাদা রক্ষার জন্য তপতীকে এই সব কথা বলতে হল। বেড়ে ওঠার আগেই বিষ দাঁত ভেঙে না দিলে আবার কেলেঙ্কারী করে বসবে। ওকে ভয় পাইয়ে রাখা দরকার।

"এইসব কথা এখনো তোমার বাবা জানে না। আর প্রদীপ যদি শোনে ?" রুবির মুখ থেকে রক্ত সরে গেল লক্ষ্য করে তপতীর ভাল লাগল। নিখিলের থেকেও এখন ওর ভয় প্রদীপকে। "যদি বাড়াবাড়ি করো তাহলে আমি বাধ্য হব তোমার কাণ্ড-কারখানা প্রদীপকে বলতে। তারপর কি আর পড়াতে আসবে ভেবেছ ?"

উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে তপতী ঘর থেকে বেরিয়েই অপ্রস্তুত ডলির মুখোমুখি হল।

"এই যে তোমার এই চিঠিটা দিতে এসেছি।" কৈফিয়ৎ দেবার মত করে ডলি দ্রুত বলল, "তোমার এক মামাতো ভাই বিকেলে এসেছিল। বসতে বললুম, বসল না। দিয়েই চলে গেল।"

ডলির হাত থেকে চিঠিটা নেবার সময় তপতী ঝাঁঝালো স্বরে বলল, "চিঠিটা দেবার জন্য অতক্ষণ দরজার পাশে দাঁড়ানোর দরকার ছিল না।"

"দরজার পাশে আমি দাঁড়াইনি।" ডলি তিক্ত স্বরে বলল। "তোমাদের ব্যাপার শোনায় আমার কোন আগ্রহ নেই।"

ডলি নীচে নেমে গেল। তালা খুলে নিজের ঘরে ঢুকেই তপতীর ইচ্ছা হল বিছনায় গা ঢেলে দিতে। বিকেল থেকে পরপর কতকগুলো ঘটনার মধ্যে পড়ে এখন অবসন্ন লাগছে। মামার চিঠিটায় কি আছে, দেখতে ভয় করছে। আবার কোন্ ঘটনা ওর মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে নতুন দুশ্চিন্তায় ফেলবে কে জানে। বছরে একবার বিজয়ার প্রণাম করতে যাওয়া ছাড়া মামার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নেই। হঠাৎ

ছেলের হাত দিয়ে চিঠি পাঠাবার মত কি ঘটল ?

পাখাটার ঘূর্ণিবেগ বাড়িয়ে তপতী খাটে শুল। রুবির ঘরের আলো নিভে যেতে বারান্দাটা অন্ধকার হওয়ায় মুখ ফিরিয়ে দেখল একবার। তারপর চিঠিটা চোখের সামনে তুলে ধরেও নামিয়ে নিল। রুবির অদ্ভুত ফ্যাকাসে চাহনি ভেসে উঠছে মনে। তপতীর কষ্ট হল এখন। নিষ্ঠুরের মত ভয় দেখান হয়েছে। আগের ব্যাপারটা খুঁচিয়ে তোলার কি দরকার ছিল? তপতী নিজেকে ধমকাল, আসলে আমিই বাড়াবাড়ি করেছি। রুবি তো তারপর থেকে লক্ষ্মীমেয়েই হয়ে গেছে।

তপতী কপালের উপর হাত রেখে চোখ বন্ধ করে রইল। শরীর খুলে খুলে পড়ছে ক্লান্তিতে। উঠে কাপড় বদলাবার ইচ্ছাটা পর্যন্ত বাতিল করে সে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়তে লাগল। তখন একবার তার মনে পড়ল, নিখিলকে আজ বিকেলে সূর্যের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকার সময় নারায়ণ মনে হয়েছিল। বিমানমামাকে মনে হয়েছিল খুব পুরনো একটা অশ্বত্থ গাছ মাটিতে পড়ে গেছে আর মৃত্যু ওর খুব কাছেই অপেক্ষা করছে।

ঘুমিয়ে পড়েছিল তপতী, ধড়মড়িয়ে উঠে বসল নিখিলের হাতের নাড়ায়। "বড্ড ঘুম পেয়েছিল। কখন ফিরলে ?"

নিখিলের খালি গা, পরনে লুঙ্গি, হাতে সিগারেট। অর্থাৎ খাওয়া হয়ে গেছে। তপতীর খাওয়ার ইচ্ছে নেই। রান্নাঘরে ডলি নিশ্চয় খাবার ঢাকা দিয়ে রেখেছে। কাঁচা ঘুমটা ভেঙে যাওয়ায় শরীর এখন ঘুমের আমেজ ছাড়তে রাজী নয়। বিছানার ধারে সরে গিয়ে সে নিখিলের জন্য জায়গা করে দিল। নিখিল এখন খবরের কাগজ পড়বে।

"কাপড়টাও বদলাওনি। কি ব্যাপার ?" বালিশটা চাপড়ে ফোলাতে ফোলাতে নিখিল বলল, "রাবড়ি এনেছি, তোমার আর রুবির জন্য। টেবিলে ঢাকা দিয়ে রেখেছি, খেয়ে নাও।"

তপতী দেয়ালের দিকে মুখ করে চোখ বুজে রইল। এভাবে

থাকতে তার ভাল লাগছে।

"কি হল! শরীর খারাপ নাকি?"

"ধ্যাৎ।" তপতী চোখ বন্ধ রেখেই বলল।

"তাহলে ওঠো, খেয়ে নাও। রুবি এর মধ্যেই দরজা বন্ধ করে ফেলল যে, কি হয়েছে ওর?"

"কে জানে! আদুরি মেয়ের তো কথায় কথায় রাগ।" বলতে বলতে তপতী উঠে বসল, হামা দিয়ে নিখিলের পা ডিঙিয়ে খাট থেকে নামল। আলনা থেকে শাড়ি নিয়ে ঘরের কোণে গেল বদলাতে। এই সময় নিখিলের সঙ্গে চোখাচোখি হতে দেখল ভ্রূকুটি করে রয়েছে। মনে পড়ল রাস্তার দিকের জানালাটা ভেজিয়ে দেওয়া হয়নি। সামনের বাড়ির সদ্য-গোঁপওঠা ছেলেটা প্রায়ই ওৎ পেতে থাকতো লক্ষ্য করে করে একদিন নিখিল চেঁচিয়ে বলেছিল. "অত উঁকিঝুঁকি কি দেবার কি আছে? তুমি ভদ্রলোকের ছেলে না?" তারপর থেকে ছেলেটি ওকে দেখলেই লজ্জায় সরে যায়। কিন্তু ওদের বাড়ির মেয়েরা নিখিলের কথাগুলো শুনেছে। তারা আর তপতীর সঙ্গে কথা বলে না। নিখিল ওকেই ধমকে বলেছিল "তুমিই বা সাবধান হও না কেন, জানালাটা ভেজিয়ে দেবে তো!"

তপতী ভ্রূকুটির অর্থ বুঝে জানালাটা ভেজিয়ে শাড়ি বদলাল। ব্লাউজ খুলে রাখল। পাখাটা ঢিমে তালে ঘুরছে। নিখিলই কমিয়ে দিয়েছে। ওর ধারণা আস্তে ঘোরালে কারেন্ট কম খরচ হয়। ইদানীং অর্থ সাশ্রয়ে মন দিয়ে কতকগুলো অভ্যাস তৈরী করে ফেলেছে। মাঝরাতে উঠে পাখা বন্ধ করে দেওয়া বা অফিস থেকে হেঁটে ফেরা এ সবেরই অন্তর্গত।

রাবড়ি সামান্যই রয়েছে। না খেয়ে রুবির জন্যই রেখে দিল তপতী। চিৎ হয়ে মুখের সামনে কাগজ তুলে নিখিল পড়ছে। কাগজটা কেনে প্রতুল। সন্ধ্যার পর এ ঘরে পাঠিয়ে দেয় বা তপতীই চেয়ে আনে নিখিলের জন্য। তখন চোখ বুলিয়ে মজার খবর কিছু থাকলে পড়ে নেয়।

নিখিলের মাথার কাছে পা ঝুলিয়ে তপতী বসল। হালকা ভাবে কাগজে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, "প্ল্যানটা হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ। ঠিকই করেছে তবে একটু আধটু বদলাবার দরকার হবে। অবশ্য পরে করলেও চলবে, এখন লোনের দরখাস্তের সঙ্গে এটাই সাবমিট করছি, টাকা বার করতে বড্ড দেরী হয়। সোনার দাম দেখছি আবার বাড়ছে।"

"কই বাড়ছে?" তপতী কাগজ দেখার জন্য ঝুঁকে নিখিলের গালের পাশে মুখ আনল। আঙুল দিয়ে নিখিল কাগজের একটা জায়গা দেখাল। তপতী আর একটু ঝুঁকে প্রায় গালে গাল রেখে বলল, "বাড়ছে তাতে আমার কি! কাউকে তো আর আমায় গয়না গড়িয়ে দিতে হচ্ছে না।"

শোনা মাত্র নিখিলের কপালে দু-তিনটে ভাঁজ পড়েই মিলিয়ে গেল, তপতী দেখতে পেল না। নিখিল বলল, "বুড়ি বয়সে গয়না পরার শখ হয়েছে বুঝি।"

"তোমার কাছে আমি তো শুধু বুড়ি।"

নিখিল চোখ কপালের দিকে টেনে তপতীর মুখটা দেখার চেষ্টা করতে করতে হেসে বলল, "এইটাই বোধহয় তোমার দুঃখ।"

তপতীর মনে পড়ল বিকেলে জমির পাশে বসে সে বলে ফেলেছিল, আমার দুঃখ তুমি কোনদিনই বোঝনি, বুঝতেও চাওনি। হেসে হেসে উঠল সে।

"এখনো মনে করে রেখেছ। আচ্ছা লোক তো তুমি", তপতী কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে, "আর পড়তে হবে না", বলে উঠে গিয়ে পাখাটার বেগ দু' পয়েন্ট বাড়িয়ে দরজা বন্ধ করে, আলো নিভিয়ে, খাটে উঠে আবার বলল, "দুঃখ সব মানুষেরই কিছু না কিছু থাকে, তোমারও কি নেই যে অত খোঁটা দিচ্ছ।"

"নিশ্চয় আছে। দুঃখ ছাড়া মানুষ চলতেই পারে না। একমাত্র মরা মানুষেরই সুখ দুঃখ নেই।" নিখিল পাশ ফিরল ওর দিকে। তপতী বাসি ঘামের গন্ধ পেল।

"তাহলে আমারও আছে। আমি জানি না, বুঝতে পারি না।" তপতী হাত রাখল নিখিলের পাঁজরে।

"বোঝার চেষ্টা করা উচিত, নইলে সুখ কখন এল কখন গেল টেরই পাবে না।"

"তুমি টের পাও?"

উত্তরে নিখিল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "একটু হাত বুলিয়ে দাও।"

তপতী বুকে পিঠে ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকল। কিছুক্ষণ পর নিখিল বলল, "আমার মধ্যে কিসের যেন একটা অভাব সব সময়ই আছে মনে হয়। পরিপাটি করে নিশ্চিন্ত হতে ইচ্ছে করে, জমির চার কোণে সীমানা দিয়ে যেমন নিশ্চিন্ত হয়! কেন জানি, মনে হচ্ছে সংসারকে বোধহয় চারদিক দিয়ে বাঁধতে পারিনি, একদিকের পিলার সব সময়ই খুঁজে পাচ্ছি না।"

"আর বাঁধার কি আছে।"

কনুইয়ে ভর দিয়ে ঊর্ধ্বাংশ তুলে নিখিল কাছে সরে এলো। সেই-ভাবে কিছুক্ষণ থেকে তপতীর গালে ঠোঁট ছুঁইয়ে বলল, "আমি যে একটা পুরুষ সেটা একমাত্র তুমি আছ বলেই বুঝতে পারি।"

তপতীর চোখ মুদে এল। বহুদিন পর মনের খুব কাছে এসে নিখিল কথা বলছে। আজকের দিনটা কি অদ্ভুত। এক চিলতে জমিটা দেখে আসা থেকেই ও যেন যুবক হয়ে উঠেছে। নিখিলের হাতটা তুলে এনে স্তনের উপর রাখল সে এবং লজ্জা পেল। সঙ্গে সঙ্গে হাতটা নামিয়ে দিল। আঠারো বছর আগের দেহকে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। নিজের দেহে হাত রাখতে গিয়ে তপতী রাখল না। দেহের সব জায়গা থেকে যৌবন চলে যাচ্ছে। এর জন্য কোনদিন কি দুঃখ হয়েছে? মনে মনে সে জবাব দিল—এইটেই তো নিয়ম। এজন্য দুঃখ করার কি আছে। বয়সও তো কত রকমের জিনিস দিচ্ছে—অভিজ্ঞতার গর্ব, বিবেচনা করার ক্ষমতা,—যৌবন কি এসব দিতে পারে?

"আর বুঝতে পারি বলেই মনে হয় আমার মধ্যে কিসের যেন একটা অভাব রয়েছে। সেটা যে কী জানতে পারি না।" এই বলে নিখিল তপতীর দেহে হাত রাখল। রোমাঞ্চ লাগল তপতীর। তার মনে হল, হু-হু বাতাস বইছে এবং বিরাট মাঠের মধ্যে সে একফালি জমি হয়ে শুয়ে আর তার উপর নিখিল নারায়ণের মত। অত্যন্ত সুখে সে দুই উরু প্রসারিত করে নিখিলের দেহভার গ্রহণ করল। তখন মনের মধ্যে একটি কথা, 'আমার পুরুষ, আমার পুরুষ'—বারবার উত্থিত হয়ে তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল। এই সময় হঠাৎ তার চোখে মুহূর্তের জন্য ভেসে উঠল, শায়িত প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের মত একটা দেহ। অহেতুক একটা ভয় কয়েকবার তার বুকের মধ্যে থরথর করে উঠল।

একটু পরই ক্লান্ত তপতী ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ চার ॥

পাখার হাওয়ায় মামাবাবুর চিঠিটা খাটের তলায় ঢুকে গেছল। পরদিন দুপুরে ঝাঁট দিতে গিয়ে তপতী দেখতে পায়। না পড়েই কাল ঘুমিয়ে পড়েছিল, হয়তো তখনই মেঝেয় পড়ে যায়।

চিঠিটা পড়তে শুরু করল তপতী। প্রথম দিকে মামুলী কথা। মামীর অসুখ আর সারছে না এবং সারবেও না। ছেলেদের মধ্যে সুবোধ মাসে ষাট টাকার বেশি দেয় না, বিয়ে করেও টাকা বাড়ায়নি। প্রবোধ চাকরি পেয়ে নাইট কলেজে ভর্তি হয়েছিল কিন্তু পড়ার থেকে অফিসের ধর্মঘট চালানাতেই উৎসাহ বেশি, বাড়িতে কমদিনই থাকে। নীরদ হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে টাইপ শিখছে আর দুটো টিউশ্যানি করে। সোনা এবং রূপোর জন্য পাত্র খোঁজা হচ্ছে, কিন্তু লেখাপড়া না শেখায় এবং দেখতে সুশ্রী না হওয়ায় পাত্রপক্ষরা যে পরিমাণ দাবী জানাচ্ছে তা দেওয়ার সামর্থ্য নেই। মেয়ে দুটি দিন দিন মনমরা হয়ে যাচ্ছে।

পুরো দু'পাতা ধরে পারিবারিক পরিস্থিতির বিবরণ। তপতী বিরক্ত হয়ে তৃতীয় পাতা পড়তে শুরু করল—"কুড়ি বাইশ দিন আগে বিমান উইল করিয়াছে। তাহার ধারণা হইয়াছে সে আর বাঁচিবে না। তাহার সনির্বন্ধ অনুরোধে আমি সেই উইলের একজিকিউটর হইয়াছি। উইলটি আমার নিকটই আছে। আমারও বয়স হইয়াছে, মরণকাল আমারও আসন্ন। তাই তোমাকে অতি সত্বর আমার সহিত দেখা করিতে বলিতেছি। অবশ্য বিমান বলিয়াছে, তাহার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত যেন কাহাকেও উইলের বিষয়বস্তু জানানো না হয়। কিন্তু আমি হঠাৎ মরিয়া গেলে তুমি তো জানিতেও পারিবে না এই উইলটির কথা। পত্রপাঠ নিখিলকে সঙ্গে লইয়া আসিবে।"

চিঠিটার দিকে তপতী খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ক্রমশ বুঝতে পারল, একটা অক্ষরও সে পড়তে পারছে না। দু-তিনবার চেষ্টা করে বুঝতে পারল, পড়ার আর দরকার নেই, সবই মনে আছে। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নটি এইবার তাকে কুঁরতে শুরু করে দিল। উইলের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? বিমানমামার সঙ্গে কোন আত্মীয়তাই নেই, তাহলে আমাকে কেন মামাবাবু উইলের কথা জানাচ্ছেন! উইল তো কাউকে বিষয় সম্পত্তি দিয়ে যাবার জন্যই করে। বিমানমামা তাঁর সম্পত্তিও নিশ্চয় কাউকে দিয়েছেন কিন্তু মামাবাবু আমাকে কেন দেখা করতে বলছেন? আমাকে কি কিছু দিয়েছেন বিমানমামা?

হঠাৎ তপতীর মনে পড়ল, সেই বাবলু ছেলেটা বলেছিল 'আত্মীয় সেজে এখন অনেকেই আসবে, বুড়োর বাড়ি রয়েছে না!' তপতী বিহ্বল হয়ে ভাবল—বাড়ি, বিমানমামার একটা বাড়ি আছে বটে। কিন্তু সেটা কি উনি উইলে আমায় দিয়েছেন! অসম্ভব, অবাস্তব হাস্যকর কল্পনা। যার সঙ্গে কোন দূর সম্পর্কের আত্মীয়তাও নেই, তাকে কেউ কম করে ষাট-সত্তর হাজার টাকা দামের বাড়ি দিয়ে যাবে, একথা পাগল হলেই ভাবা যায়। আর পাগল হলেই এমন-ভাবে কেউ দিতে পারে।

কিন্তু বিমানমামার সঙ্গে শেষ যেবার কথা বলে এসেছে, কোন অস্বাভাবিক আচরণ তখন দেখেছে বলে মনে করতে পারল না তপতী। জানলার ধারে ইজিচেয়ারে শুয়ে বাইরে তাকিয়েছিলেন। ভরদুপুরে কলকাতার পুরনো গলিতে এক ধরনের বিষণ্ণ নির্জনতা বিরাজ করে। তপতী নিজেও মাঝে মাঝে খাটে শুয়ে জানলা দিয়ে একদৃষ্টে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। মন ভার হয়ে আসে, নানান পুরনো কথা মনে পড়ে তখন। আর মনে হয় বেশিদিন বোধ হয় বাঁচব না। বিমানমামা অনেকক্ষণ একদৃষ্টে মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। চাউনির মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু ফুটে উঠেছিল কি?

তপতী মনে করার চেষ্টা করে খেই পেল না। হয়তো চাউনিতে মৃত্যুর কথা ভেবে বিষণ্ণতার ভাব ছিল। কিন্তু পাগলের লক্ষণ তাকে বলা যায় না। তারপর মুখ ফিরিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকান। ফ্ল্যাট বাড়িটার দিকে আঙুল তুলে বলেন, "ওটা না থাকলে কালী-মোহনদের আগেকার বাড়িটা এখান থেকে দেখা যেত।" আবার অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলেন, "একজনের মুখে আর এক-জনের আদল এত অদ্ভুতভাবে কি করে যে"—থেমে গেছলেন। এক সময় হেসে উঠে বলেন, "এমন কোন ওষুধ যদি আবিষ্কার হতো, খেলেই চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে যাওয়া যেত! একবার একটা ইংরিজি গল্পে পড়েছিলাম এমন একটা ঘটনা, ওষুধ খেয়ে যৌবনে ফিরে গেছল একজন, ভয়ঙ্কর দুঃখের গল্প।" তারপর গল্পটা বলেছিলেন।

তপতী এবার ভাবল, সে নিজেই অস্বাভাবিক চিন্তা শুরু করেছে। বাড়ি ছাড়াও বিমানমামার আরো অনেক কিছু আছে। পুরনো অনেক বই, ঘড়ি, এসরাজ, পালঙ্ক, আয়না, চিনেমাটির বাসন। এসবের কিছুও তো দিতে পারেন! তাহলে, বাড়ির চিন্তা কেন মনে এল? বোধহয় বাবলুর কথাতেই মনে লোভের সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু কেন হল? এ যে অকল্পনীয় চিন্তা। তার ইচ্ছা করল চুপিচুপি একবার বিমানমামার খোঁজ নেওয়ার।

রুবি আজ কলেজ যায়নি। মাথা ধরেছে বলে সকাল থেকেই বিছানায়। তপতী যতবার ঘরে গেছে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ডলি প্রতিদিনের মতই সংসারের কাজ করে যাচ্ছে। দরকার হলে তপতীর সঙ্গে কথাও বলছে, কিন্তু প্রয়োজনের বেশি একটি নয়। পূরবীর সঙ্গে কোন কোন দিন একটিও কথা হয় না. আজ সকালে বাসনমাজার ঝি পুষ্পকে যখন সে বলছিল, কাল জমি দেখতে গেছলাম, পূরবী তখন কলঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁতে ব্রাশ চালাচ্ছিল। থামিয়ে মুখের ফেনা নর্দমায় ফেলে জিজ্ঞাসা করে, "কবে তোমরা বাড়ি করছ? আমরাও তো কাল নিউ আলিপুরে ফ্ল্যাট দেখতে গেছলাম। বাব্বাঃ ভাড়া কী। আড়াই শো তিন শো!" তপতী বলে, "ঠিক করে ফেলেছ?" পূরবী কুলকুচো শেষ করে জবাব দেয়, "আরো দু-চারটে দেখি আগে। যে-ক'টা দেখলাম তার কোনটাতেই ভাল ডাইনিং স্পেস নেই। বাইরের লোকজনকে খাওয়াবার মত বড় টেবিল রাখার জায়গা না পেলে—" পূরবী কলঘরের দরজা বন্ধ করে দিতেই তপতী এবং পুষ্প একই সঙ্গে ঠোঁট বেঁকিয়ে চোখাচোখি করেছিল।

তপতী কাপড় বদলে চটি পায়ে নীচে নেমে এল। ডলি সদরে দাঁড়িয়ে সামনের বাড়ির বৌয়ের সঙ্গে কথা বলছিল হঠাৎ চুপ করে গেল। ওর পাশ কাটিয়ে তপতী বেরিয়ে যাওয়ার পর ডলি গলা নামিয়ে বলল, "জমি কিনেছে। বাড়ি করার জন্য এখন শুধু পয়সা জমাচ্ছে।"

"এই বিকেলে বেরোল কোথায় গা?"

"কে জানে। আমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামাই না। দরকার কি আমার। ভাল কথা বলতে গেলে তো ক্যাটক্যাট করে শুনিয়ে দেবে।"

ট্রাম লাইন থেকে বিমানমামার বাড়ির রাস্তায় ঢুকতে গিয়ে তপতী থমকে পড়ল। পাঁচ-ছ'টি ছেলে বাড়িটার ফটকের কাছে

দাঁড়িয়ে। চেহারায় এবং পোশাকে-আসাকে বাবলুর মতই। সম্ভবত বাবলুরই বন্ধু। তপতী ইতস্তত করল। নিশ্চয় ওদের সঙ্গে বাবলুও আছে। তাকে দেখে আবার হয়তো কালকের মত পথ আটকে চোয়াড়ে মেজাজে বলবে—যাওয়া হবে না। কিংবা হয়তো ওই ছেলেগুলোকে শুনিয়ে বলবে—আত্মীয় সেজে এখন অনেকেই আসবে। বুড়োর বাড়ি রয়েছে না!

কথাটা মনে পড়ামাত্র অপমানে গরম হয়ে উঠল তপতীর দুই কান। ছেলেগুলো খুব কিছু হৈ-চৈ করছে না। ওদের থেকে প্রায় পনেরো গজ আগে ফ্ল্যাট বাড়িটার দরজা। সেখানে বছর ষোলর দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে, হাতে বই। দেখেই বোঝা যায় স্কুল থেকে ফিরল। হঠাৎ তপতীর মনে পড়ল, প্রদীপ বলেছিল তার এক মামাতো দিদি এই ফ্ল্যাটের দোতলায় থাকে। তাহলে তার কাছ থেকেই জেনে নেওয়া যেতে পারে বিমানমামার খবর। পাশাপাশি বাড়ি যখন নিশ্চয় বলতে পারবে।

তপতী এগিয়ে এসে মেয়ে দুটির একজনকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমরা কি এই বাড়িতে থাক?"

"আমি থাকি।" মেয়ে দুটির একজন বলল।

"দোতলায়?"

"হ্যাঁ। কাকে চান আপনি?"

"আচ্ছা প্রদীপ সাহা নামে তোমাদের কোন আত্মীয় আছে?"

"সে তো এখানে থাকে না।"

"তা জানি। কে হয় তোমার, মামা? মায়ের পিসতুতো ভাই?"

অবাক হয়ে মেয়েটি ঘাড় নাড়তেই তপতী আবার বলল, "আমি একটা খবর নিতে এসেছি। আচ্ছা তোমাদের পাশের ওই বাড়িতে—" বলতে বলতে তপতী মুখটা বিমানমামার ফটকের দিকে ফেরাল এবং ছ্যাঁত করে উঠল তার বুক। ছেলেগুলোর মধ্য থেকে একজন তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে, মুখের বাঁদিকের আধখানা ঝলসানো।

বাঁ চোখটা গলে যাওয়ায় সেখানে গর্ত। গালের চামড়া এবং মাংস বালিখসা দেয়ালে বেরিয়ে থাকা ইটের মত রঙ নিয়ে দগদগ করছে।

"তোমার মা আছেন তো, চলো তাঁর সঙ্গেই কথা বলব।" এই বলে, উত্তরের অপেক্ষা না করেই তপতী দ্রুত ফ্ল্যাট বাড়ির ভিতর ঢুকে এল। বিস্মিত মেয়েটি তাকে নিয়ে দোতলায় উঠল। ওর মা, বয়সে তপতীর থেকে কয়েক বছরের ছোটই হবে, যত্ন করে তাকে বসাল।

"প্রদীপ আমার মেয়েকে পড়ায়, ওর কাছেই আপনাদের কথা শুনেছি। আমি এসেছি একটা খবর নিতে। পাশের ওই বাড়িতে, যেটায় গাড়ি-বারান্দা তার পাশে জানলা, ওখানে লম্বা-চওড়া খুব ফরসা সুন্দর দেখতে এক বৃদ্ধ থাকে জানেন?"

"কি জানি, আমাদের ঘর থেকে তো সবটা ভালো দেখা যায় না। উনি হয়তো বলতে পারবেন।"

"আমি দেখেছি।" মেয়েটি বলে উঠল, "দু-একবার জানলার কাছে চেয়ারে বসে চুপচাপ বাইরে তাকিয়ে থাকেন তো?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, উনিই। আমার মামা হন সম্পর্কে। খুব অসুখ শুনে কাল দেখা করতে এসেছিলাম, ওর ভাড়াটের ছেলেটা, বাবলু নাম, এমন বিশ্রী ব্যবহার করল যে আর যেতে ইচ্ছে করল না। তাই ভাবলুম আপনার এখানে এসেই খোঁজটা নিয়ে যাই।"

"ও ছেলেটা তো একটা গুণ্ডা।" মেয়েটি আবার বলে উঠল। "টাকা দিলেই গুণ্ডামি করে আসবে। ওই যে গেটটা, ওর পাশে বসে বোমা তৈরী করে আর ভেতর দিকে একটা রক আছে, সেখানে রোজ রাত্তিরে বসে অনেকে মিলে মদ খায়, তবে পাড়ায় ঠাণ্ডা থাকে, কিছু করে না।"

কিন্তু তপতী আগ্রহ বোধ করল না এই সব খবরে। একটা দগদগে মুখ একচোখে তার দিকে তাকিয়ে, এই দৃশ্যটি তাকে এখনো সন্ত্রস্ত করে রেখেছে। রুবির জন্যই ছেলেটি কুৎসিত হয়ে গেল।

কিন্তু সেজন্য তো ও নিজে ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়, কেউ ওকে মারামারি করতে বলেনি। তপতী নানাবিধ যুক্তি দিয়ে দায়মুক্ত হবার চেষ্টা করতে গিয়েও ভাবল, তাহলে এতদিন পরেও কেন ওএভাবে তাকাবে? রুবিকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসার সময়ও মাঝে মাঝে তার চোখে পড়েছে। দূরে দাঁড়িয়ে থাকত, তপতী তাকালেই বীভৎস মুখটা ঘুরিয়ে নিত। রুবি মাথা নিচু করে রাস্তায় চোখ রেখে চলত। কিন্তু কোনদিনই ও কাছে আসার চেষ্টা করেনি। দূর থেকে দেখেই চলে যেত। কিছুদিন পর আর ওকে দেখা যায়নি।

আবার দেখল আজ। তপতী বুঝতে পারছে না মুচকি হাসছিল কি না। কোনরকম গোলমাল করবে কি? রুবির সঙ্গে তোলা ফটো বা রুবির কোন চিঠি এখনো যদি রেখে দিয়ে থাকে! তাই দিয়ে সর্বনাশ করে দিতে পারে মেয়েটার।

"আমরা তো পাড়ার কারুর সঙ্গে মিশি না, তাই খোঁজখবরও রাখি না। তবে ওনাকে বলব আপনার মামার খবরটা নিতে।"

"তাহলে খুবই ভাল হয়", তপতী আবার দ্রুত বলল। "প্রদীপকে তাহলে বলব আপনার কাছ থেকে খবরটা জেনে আমাকে যেন বলে।"

তপতী উঠতে যাচ্ছিল, উঠতে দিল না। অন্তত চা-টুকু না খেয়ে যেতে দেবে না। তারও ইচ্ছা করছে আর একটু অপেক্ষা করে যেতে। বীভৎস মুখটা এখনো হয়তো ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিমান-মামার খবর জানার থেকেও এখন তপতীর চিন্তা, কিভাবে এই রাস্তাটা চুপিসাড়ে পার হওয়া যায়। নিখিল সন্ধ্যার আগে অফিস থেকে ফেরে না। সন্ধ্যা পর্যন্ত গল্প করতে করতে কাটিয়ে রাস্তাটা আধা অন্ধকার হয়ে এলে বেরোবে, তপতী এই ভেবে নিয়ে—প্রদীপ কত ভাল ছেলে, সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করল।

বাড়ি ফিরতে একটু দেরীই হল তপতীর। সদর দরজা খোলা। উপরের শোবার ঘরটা অন্ধকার দেখে হাঁফ ছাড়ল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে অভ্যাসবশে জানলা দিয়ে ডলির ঘরের দিকে সে তাকাল।

খাটে কে একজন বসে, তার গেরুয়া পাঞ্জাবির একটা কাঁধ দেখা যাচ্ছে। দরজার পাশে মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে দাঁড়ান ডলিকে দেখে তপতী অসম্ভব অবাক হল। ওর মাথায় ঘোমটা!

লোকটি কে তাহলে? তপতী একধাপ নেমে লোকটির মুখ দেখার জন্য কুঁজো হয়ে জানলা দিয়ে উঁকি দিল।

মোটা ফ্রেমের চশমা, মাঝারি গড়নের অবিন্যস্ত চুলের কৃষ্ণকায় লোকটিকে চিনতে পেরেই তপতী ঘরের দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, "ওমা ঠাকুরজামাই যে, পথ ভুলে নাকি!"

"আরে বৌদি যে, কেমন আছেন?"

ব্রজেন উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কাব করতে তপতী কোনরকমে দুই মুঠি একসঙ্গে বুকের কাছে জড়ো করে পাল্টা নমস্কার করল। এইসব পুরুষি-কায়দায় সে একদম রপ্ত নয়।

"আছেন কেমন, বাড়ির সবাই ভাল তো? আপনার সেই ছোট ভাই যে বিলেত গেছল, ফিরেছে? মার শরীর?" তপতী যতটুকু খবর রাখত তাই ভাঙিয়ে প্রশ্নগুলো করল।

"মা তো সাত মাস হল গত হয়েছেন। ছোট ভাই ওই সময় একবার এসেছিল, আবার চলে গেছে। ওখানেই চাকরি করছে, এখন ফেরার ইচ্ছে নেই।"

"তাহলে আপনি তো প্রায় একাই।"

"হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।"

তপতী লক্ষ্য করল ডলি পাথরের মত একভাবে দাঁড়িয়ে আর ব্রজেন ওর দিকে একবারও তাকাচ্ছে না। শাশুড়ী কোথায় গেলেন? ব্রজেন এখন একা। তাহলে কি ডলিকে নিয়ে যেতেই এসেছে? আট বছর প্রায় ওদের ছাড়াছাড়ি। হঠাৎ কি কারণে এল জানার জন্য তপতীর কৌতূহল আকুলি বিকুলি করে উঠল। কিন্তু একটু কিছু ভূমিকা না করে সে কথায় আসা যায় না।

"চশমাপরা তো আগে দেখিনি, ভাবলাম, কে রে বাবা লোকটা! একটু যেন মোটাও হয়েছেন।"

"হয়েছি নাকি! যাক তবু একজন কেউ বলল। তবে বৌদি, আপনিও কিন্তু কম হননি।"

তপতী আঁচলটা তলপেটের ওপর বিছিয়ে দিতে দিতে শরীরটাকে কুঁকড়ে রাখবার চেষ্টা করল। এভাবে মেদ কমিয়ে দেখানো যায় না জেনেও সে নিঃশ্বাস বন্ধ করে পেটটাকে সঙ্কুচিত ও মুখের হাসি বজায় রাখতে চাইল। বাইরে থেকে শাশুড়ীর গলা শোনা গেল, ডলিকে ডাকছেন। তপতী ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, শালপাতার ঠোঙা হাতে প্রতিভা দাঁড়িয়ে। জামাইয়ের জন্য হয়তো নিজেই খাবার কিনতে গেছলেন বা পাশের বাড়ির চাকরকে দিয়ে আনিয়েছেন। রুবি কি বাড়িতে নেই?

ডলি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া মাত্র তপতী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, "ব্যাপার কি ঠাকুরজামাই, কি মনে করে?"

"একটা দরকার ছিল। বড়দা তো নেই, ফিরবেন কখন?" ব্রজেন গম্ভীর হয়ে বলল।

"এখুনি আসবেন, খুব গুরুতর কিছু কি?"

"হ্যাঁ, আমি আবার বিয়ে করব ঠিক করেছি। তাই ডিভোর্স চাই।"

প্লেটে চারটি সন্দেশ নিয়ে ডলি ঘরে ঢুকল সেই মুহূর্তে। হয়তো শেষের কথাটি তার কানে গেছে। অবাক হয়ে সে ব্রজেনের দিকে তারপর তপতীর দিকে তাকিয়ে প্লেটটা খাটের উপর নামিয়ে রাখল। ব্রজেন একটু বেশি ব্যস্ত হয়ে মাথা নেড়ে বলল, "এসব আবার কেন. আমি এখন কিছু খাব না।"

দরজার পাশ থেকে প্রতিভা বলে উঠলেন, "একটু মিষ্টিমুখ করো বাবা, এতদিন পরে এলে।"

কি ভাবল ব্রজেন। একটা সন্দেশ আলগোছে মুখে ফেলল। ওর সন্দেশ চিবোনো দেখতে দেখতে তপতীর দম বন্ধ হয়ে এল। কেন বিয়ে করছে, কাকে করছে, ডলি সম্পর্কে ওর মনোভাব কি— এই ধরনের প্রশ্ন সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ল তার মাথায়। ডলির

সামনে হয়তো এ সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলতে ব্রজেনের অস্বাচ্ছন্দ্য হতে পারে তাই তপতী বলল, "ওপরের ঘরে আসুন না, উনি এখুনিই তো ফিরবেন। যা বলার বরং ওপরে বসে বললেই ভাল হয়।"

ব্রজেন বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে দাঁড়াল। থমথমে হয়ে গেল ডলির মুখ। তপতী কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গিতে বলল, "তোমার বড়দার সঙ্গেই যখন দেখা করতে এসেছে, তখন ওপরে বসাই ভাল।"

উপরে এসে তপতী দেখল, রুবি একইভাবে বালিশে মুখ ডুবিয়ে শুয়ে। নিজের ঘরে ব্রজেনকে বসিয়ে পাখাটা খুলে দিয়েই আর কোন ভনিতা না করে তপতী বলল, "ঠাকুরঝিকে তাহলে একেবারেই ত্যাগ করবেন?"

"আপনি তো সব জানেনই বৌদি। ত্যাগ আমি তো করিনি, ও-ই করে চলে আসে। বিয়ের পর যদি স্ত্রী তার প্রণয়ীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, চিঠির লেনদেন করে, তাহলে কোন স্বামীর পক্ষেই সেটা সহ্য করা সম্ভব নয়, সে-সব চিঠি আজও আমার কাছে আছে। বড়দা যখন গেছলেন, ওঁকে আমি দেখিয়েও ছিলাম। তবু আমি রাজী ছিলাম এ সব ভুলে যেতে। কিন্তু ও ঝগড়া করল। আমার তরফ থেকে যা করার করেছিলাম। এখন আমি বিয়ে করব ঠিক করেছি। সুতরাং ডিভোর্স আমি চাই।"

"কিন্তু তাহলে তো ওকে সারাজীবন আমাদেরই টানতে হবে।"

"তা হবে। যে একজনের সঙ্গে এত গভীরভাবে লিপ্ত, তার সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে আমার সঙ্গে দিলেন কেন?"

"আমরা কেউ কিচ্ছু জানতাম না, বিশ্বাস করুন, কিচ্ছু না।" তপতী করুণভাবে জবাবদিহি করল ব্রজেনের তিক্ত প্রশ্নের। অবিশ্বাস-ভরে তাকিয়ে আছে দেখে তপতী আরো মাথা নামিয়ে মৃদুস্বরে বলল।

"অবশ্য আপনি একথা বলতেই পারেন। দোষ তো আমাদেরই। কিন্তু বিশ বছরের মেয়েরও তো বলা উচিত ছিল—অমুককে ভালবাসি, তাকেই বিয়ে করব। বললে নিশ্চয় খুব একটা আপত্তি উনি করতেন

না। রবি তো আমাদেরই স্বজাতি। আশ্চর্য, আর পাঁচটা মেয়ের মতই কেমন বিয়েতে বসল। কত ঠাট্টা তামাসাও করলাম। বাসরে তো আপনিও দেখেছেন, কেমন লাজুক-লাজুক ভাব।"

"যাকগে ওসব কথা। দোষ আমাদের ভাগ্যের। তবে যতটা পারা যায় ক্ষতিটা পূরণের চেষ্টাই করা উচিত। আটটা বছর বরবাদ হয়ে গেল জীবনের, আমিও তো মানুষ, বৌদি।"

ব্রজেনের আটটা বছর হারানোর বেদনা তপতী চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল। তার মনে হল ব্রজেনের হেলানো মাথা, খাটের উপর রাখা দুটো হাত আর গেরুয়া পাঞ্জাবি ঢাকা শরীরটায় পোড়ো বাড়ির আদল। আট বছর সেখানে কেউ বাস করেনি।

তপতীর কেমন সন্দেহ হল, দরজার বাইরে কেউ দাঁড়িয়ে। সন্তর্পণে এগিয়ে হঠাৎ উঁকি দিল সে। চমকে ফ্যাকাশে মুখে ডলি তাকাল। চোখে ভয়। তারপর দ্রুত একতলায় নেমে গেল। তপতী খুব অবাক হল না; ডলির স্বভাব সে জানে।

"বৌদি এবার চলি, আমার এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে।" ব্রজেন উঠে দাঁড়াল।

"আর একটু বসুন না, উনি এখুনি আসবেন। যে কথাটা বলতে এসেছেন বলেই যান।"

"আপনাকে তো বললাম, আপনিই বরং বলে দেবেন। ডিভোস স্যুট ফাইল করব. এ তরফ থেকে অ্যাপিয়ার না করলেই হল। চুপচাপ ব্যাপারটা ঘটে যাওয়াই উচিত। আর যদি মনে করেন মামলা লড়বেন তাহলে লড়তে পারেন। কিন্তু কোন সুবিধে হবে বলে তো মনে হয় না।"

"বিয়ে কি নিজেই ঠিক করলেন?"

"হাঁা, ইনিও স্কুলে পড়ান, বিধবা, একটি সাত বছরের ছেলে আছে।" একটু হেসে ব্রজেন যোগ করল, "বছরখানেক আলাপ।"

ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির মাথায় ব্রজেন ঘুরে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলল, "অসহ্য লজ্জা পেয়েছিলাম বৌদি, পুরুষ মানুষ হলে বুঝতে

পারতেন, স্ত্রী অন্য পুরুষে আসক্ত জানলে স্বামীর কি মনের অবস্থা হয়।"

তপতী ঘাড় হেঁট করে ব্রজেনের পিছনে নেমে এল। প্রতিভা পায়ের আওয়াজে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

"এখুনি চলে যাচ্ছ বাবা ?"

"হ্যাঁ মা।"

"আবার আসবে তো ?"

তপতীর মুখের দিকে তাকিয়ে ব্রজেন অস্পষ্টভাবে বলল, "দেখি।"

বৃদ্ধার চোখ প্রত্যাশায় চকচক করছে। আঁচলে চোখ মুছে তিনি সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। মেয়ের ভবিষ্যত কি চেহারা নেবে প্রতিদিন তারই নৈরাশ্যকর রূপ দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। হঠাৎ ব্রজেন আসায় প্রতিভা দিশাহারা।

"ওকে নিয়ে যাবে তো বাবা ?"

ব্রজেন তখন রাস্তায় অনেকখানি এগিয়ে গেছে। উত্তরে কি বলল বোঝা গেল না। তপতীর হাত চেপে ধরে ফিসফিস করে প্রতিভা বলল, "হ্যাঁ বৌমা, ডলিকে নিয়ে যাবে বলল কি ?"

"সে রকম কিছু তো বলল না। আপনার ছেলের সঙ্গে কি যেন কথা আছে, আমার কাছে তা ভাঙল না।"

"আবার আসবে বলল ?"

"বোধহয় আসতে পারে।"

"তাই হোক শ্রীধর, তাই যেন হয়।"

প্রতিভাকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তপতী দোতলায় উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ডলিও এল।

"কি বলল তোমায় ?"

কাপড় বদলাবার জন্য জানলা বন্ধ করছিল তপতী। ঘুরে দাঁড়াল। ডলি হাঁফাচ্ছে। চোখ জ্বলজ্বলে, ঠিকরে বেরিয়ে আসবে বোধহয়। চোয়াল দুটো চেপে বসেছে।

"তুমি তো আড়াল থেকে শুনেছ, কি বলল !"

"না, করতে দেব না। কিছুতেই দেব না।"

"কী করতে দেবে না, ডিভোর্স?"

"কেন, আমার জীবনটাও কি জীবন নয়? আমার আটটা বছর কি খুব সুখে কেটেছে?"

"সেজন্য তুমি নিজেই দায়ী। অপরাধ তোমারই। ফল তোমাকেই ভোগ করতে হবে। তোমার জন্য অপরে কেন বঞ্চিত থাকবে?"

তপতীর তীব্র ঝাঁঝালো স্বরে ডলি থতমত হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। ধীরে ধীরে চোখ জলে ভরে উঠল তার। জড়ানো কাঁপা স্বরে বলল, "আমি তো আর বিয়ে করতে পারব না। বাকি জীবনটা তাহলে আমি কি করব?"

"সে কথা রবিকেই জিজ্ঞাসা করো।"

ডলি মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল। বছর পাঁচেক আগে বেকার রবি জার্মানি চলে যায়। তারপর থেকে ওর কোন খবর নেই।৫ তপতী কাপড় বদলাতে শুরু করেছে। সদর দরজা ঠেলে কারুর ঢোকার শব্দ হল। ডলি ইতস্তত করে কাতর স্বরে বলল, "তুমি একটু দাদাকে বলবে?"

"কি বলব?"

"মামলা লড়ার জন্য।"

"তার জন্য টাকার দরকার, লোকেরও দরকার। টাকা কোথায়? কে ঝক্কি পোয়াবে?"

"তোমার টাকা নেই? তবে বাড়ি করছ যে!"

শোনামাত্র বিরক্তি আর রাগে তপতীর মাথা গরম হয়ে উঠল। প্রায় চীৎকার করেই সে বলল, "হঁ্যা, আমাদের অনেক টাকা, বাড়িও করছি। তবে সে টাকা ভস্মে ঢালার জন্য নয়, তোমার মত মেয়ের আবদার পূরণের জন্যও নয়।"

সিঁড়ির মাথায় নিখিলকে দেখে তপতী চুপ করে রইল। ডলি মাথা নিচু করে নিখিলকে পাশ কাটিয়ে নেমে গেল। জামা খুলতে খুলতে নিখিল বলল, "কি ব্যাপার, ডলিকে কি বলছিলে?"

উত্তেজনা তখনো কমেনি তপতীর। গলা চড়িয়ে সে বললে,

"মামলা লড়তে বলছে। বাড়ি করতে পার আর বোনের জন্য এটুকু করতে পারবে না, তাই বলতে এসেছিল।"

এরপর তপতী সবিস্তারে ব্রজেনের হঠাৎ আসা এবং তার বলা কথাগুলো নিখিলকে শুনিয়ে দিল। কিন্তু বিকেলে তার নিজের বাইরে বেরোনর কথা বলল না। শুনতে শুনতে নিখিল গম্ভীর হয়ে উঠল।

"ওর জন্য আমার দশ ভরির গয়না গেছে, লোকের কাছে এন্তার মিথ্যে কথা বলতে হয়েছে, তোমাকেই সব ধার-দেনা শুধতে হয়েছে ওর বিয়ের, ভাইয়েরা তখন তো রোজগারও করে না। এখন তারা মোটা রোজগার করছে, নিজের মায়ের পেটের ভাই, তাদের কাছেই এবার যাক, তারা করুক এবার।"

'তারা' বলতে প্রতুলকেই বোঝাল তপতী। মেজ ভাই অখিল অবিবাহিত। ক্লাস সেভেনে দুবার ফেল করে পড়ায় ইস্তফা দিয়ে ট্যাক্সিওলাদের সাগরেদি শুরু করে। একদিন নিখিলের হাতে বেদম মার খেয়ে বাড়ি থেকে পালায়, চার মাস পর জয়পুর থেকে চিঠি দিয়ে জানায়, চিন্তার কারণ নেই। একটা দোকানে চাকরি পেয়েছি। এর বছরখানেক পর চিঠি দেয়, মিলিটারিতে ঢুকেছি। ডলির বিয়েতে সে একশো টাকা পাঠিয়েছিল। অখিলের শেষ চিঠি এসেছিল ন মাস আগে। মিলিটারি ছেড়ে এখন সে পুনায় আনাজের ব্যবসা করছে। অখিলকে এ বাড়ির কেউ আর মনে করে রাখেনি। তপতী ওকে দেখেইনি।

"ব্রজেনের সঙ্গে মামলা লড়েও জেতা যাবে না। আইন ওর দিকেই। সেই সময়ই আমি উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলাম।" নিখিল বিব্রত স্বরে বলল। তপতী খুশী হল শুনে। মামলায় টাকা ঢালার ইচ্ছে তাহলে নিখিলের নেই। তবু ভয় আছে। লোকের কথাকে নিখিল খুবই অপছন্দ করে। যদি হঠাৎ ভাবতে শুরু করে—সৎ বোন বলে অবহেলা করছি, লোকে যদি বলে বড় ভাইয়ের দায়িত্ব পালন করিনি। তাহলেই নিখিল মামলায় ঝাঁপিয়ে পড়বে। ডলিকে গান শেখাবার জন্য রবিকে নিযুক্ত করেছিল

নিখিলই। অতএব এই ঘটনার জন্য সেও কিছুটা দায়ী, এমন একটা ধারণা ওর মনে গাঁথা হয়ে গেছে। তপতী বলল, "এসব মামলা তো আর চুপি চুপি হয় না। জানাজানি হবেই। তখন আর মুখ দেখান যাবে না। তার থেকে বরং যেমন আছে থাকুক, ব্রজেন যা বলল তাই হোক, অ্যাপিয়ার না করলেই হল। মামলা লড়ে জিতলেও তো কোন লাভ নেই ডলির। তারপর কি আর স্বামীর ঘর করতে পারবে?"

নিখিল চুপ করে বসে তপতীর কথাগুলো কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, "খেতে দাও, এখুনি একবার বেরোব।"

নিখিল বেরিয়ে যাবার পর রুবির কাছে এসে তপতী বলল, "হয়েছে কি? এমন কি বলেছি যে সকাল থেকে না খেয়ে শুয়ে থাকতে হবে?"

"বিরক্ত করো না।" রুবি মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে থাকল।

"বিরক্ত আমি করছি, না তুই করছিস। যা বলেছি তোর ভালর জন্যই। প্রদীপের সঙ্গে অত মাখামাখি কেন? যে কাজ করেছিস তাতে কলকাতা থেকে অনেক দূরে তোর বিয়ে দিতে হবে। বিয়ের পর জানাজানি হলে কি তুই সুখী হবি? তাছাড়া প্রদীপকে তো আসতে বারণ করিনি। আসুক, যেমন পড়াচ্ছে পড়াক। সাবধান তুই হবি।"

তপতীর ইচ্ছে করছিল ডলির উদাহরণটা শুনিয়ে দিতে! কিন্তু রুবি জানে না ডলির বাপের বাড়ি থাকার আসল কারণ। ও জানে, পিসেমশাই সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ত্যাগ করে গেছে। তাই জানাই ভাল।

"ওঠ, খেয়ে নে।" তপতী রুবির কাঁধে ঝাঁকুনি দিল। ছিটকে উঠে বসল রুবি। চোখ দুটি ফোলা, চুল আলুথালু।

"আমি জানি, সারা জীবন তোমার ইচ্ছে অনুযায়ী আমায় চলতে হবে, আমাকে ভয় দেখাবার অস্ত্র তুমি রেখে দিয়েছ। তাই দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমার জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে। আমার

ইচ্ছে-অনিচ্ছে বলে আর কিচ্ছু রইল না, রইল না।" বলতে বলতে রুবির কণ্ঠ বিকৃত হয়ে গেল। দু চোখ ছাপিয়ে জল নামল। তাই দেখে তপতীর মন ভার হয়ে এল।

"যেদিন তুই আমার বয়সী হবি আর তোর বয়সী মেয়ে থাকবে, সেদিন আমায় বুঝতে পারবি।" তপতী ম্লান হাসল।

"আমি বুঝতে চাই না। কাউকে বিয়ে করব না, কাউকেই না।"

তপতী বিষণ্ন মনে ঘর থেকে বেরিয়ে দালানের অন্ধকারে দাঁড়াল। আগের বারের মত দু-চার মাসেই রুবি ধাতস্থ হয়ে যাবে, কিন্তু— তপতী ভাবল—মাকে ও ঘৃণা করবে। আজীবন করবে। কিন্তু উপায় নেই। তপতী নিজেকে বলল, ভালমন্দ বোঝার বয়স ওর হয়নি। একদিন নিশ্চয় বুঝবে কেন আমি আপত্তি করেছিলাম।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে তপতীকে দেখে একটি ছায়ামূর্তি আবার নিঃশব্দে নেমে গেল। তপতী বুঝল ছায়ামূর্তিটি ডলি। বোধহয় প্রতুলের কাছে যাচ্ছিল। প্রতুল কি ডলির জন্য মামলা লড়বে? যে শুধু মেপে, গুণে, সংসারের এজমালি ভাগের খরচের টাকাটি দেওয়া ছাড়া আর কোন দায়িত্ব পালন করে না, সে বোনের জন্য টাকা ঢালবে? অসম্ভব! প্রতুলের তেরো বছর বয়স থেকে তপতী ওকে দেখে আসছে। এম-এস-সি পর্যন্ত পড়ার খরচ নিখিলই টেনেছে। এখন প্রতুল বারোশো টাকা মাইনের চাকুরে। শুধু চাকরি আর উন্নতির ভবিষ্যৎ দেখেই পূরবীর বাবা মেয়ের বিয়ে দেয়। শ্যামবাজারে বাড়ি ভাড়া নিয়ে বিয়ে হয়। প্রতুল হাজার পাঁচ-ছয় খরচ করেছিল নিজের বিয়েতে। এত টাকা চাকরি করে দু বছরেই জমিয়েছে! তপতী তখন অবাক হয়ে গেছল। জমি কেনার সময় নিখিলকে বলেছিল, "ঠাকুরপোর কাছ থেকেই ধার নাও না।" নিখিল জবাব দিয়েছিল, "যদি না খেয়ে মরতে হয় তবু ওর কাছে হাত পাতব না। লোকে তাহলে বলবে, এক সময় খরচ করেছিলুম সেই টাকা ফিরিয়ে নিচ্ছি।"

প্রতুল বাড়ির কারুর সঙ্গেই কথা বলে না। সকাল সাড়ে আটটায়

অফিসের গাড়ি আসে, সন্ধ্যায় ফেরে। পূরবী যতক্ষণ একা থাকে শুধু রুবিই ওর সঙ্গী। রুবি মারফত প্রথম তপতী শোনে, ওদের এ বাড়িতে থাকতে অসুবিধা হচ্ছে। শুনে প্রথমেই তার মনে হয়, বাড়ি ভাড়ার অর্ধেক, পঁয়তাল্লিশ টাকা প্রতুল দেয়, সেটা তাহলে নিখিলেব ঘাড়েই চাপবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তপতী খুশী হয়েছিল।

ওদের ঘর থেকে চাপা হাসির শব্দ তপতী শুনতে পেল। কৌতূহলী হয়ে দু পা এগিয়ে দরজার দিকে তাকাল সে। একটা পাল্লা ভেজানো, পর্দাটা পাখার হাওয়ায় উড়তেই দেখল পূরবীর কোলে মাথা রেখে, দু হাতে ওর গলা জড়িয়ে প্রতুল শুয়ে। এ রকম দৃশ্য আগেও দেখেছে সে। পাকে প্রকারে জানিয়েও দিয়েছে, বাড়িতে উঠতি বয়সী একটা মেয়ে আছে, সুতরাং এ সব ব্যাপারের সময় দরজা বন্ধ রাখা উচিত। পূরবী গ্রাহ্য না করে বলেছিল, 'মেয়ে সবই জানে, সবই বোঝে। দুদিন পরেই তো বিয়ে হবে, এখন দেখলে কি আর এমন চরিত্র খারাপ হবে!' রেগে উঠে তপতী বলেছিল, 'ওসব কথা তোমাদের বাপের বাড়ির সমাজেই খাটে, এ বাড়িতে থাকলে এ বাড়ির নিয়ম অনুযায়ী চলতে হবে। ভাসুরকে দেখে মাথায় কাপড় নয় নাই দিলে, কিন্তু সভ্য হয়ে ঘরে থাকবে তো। এইসব দেখতে দেখতেই তো মেয়ে বিগড়োবে।' পূরবী তখন প্রচণ্ড রাগ চেপে কঠিন গলায় বলেছিল, 'মেয়ের চরিত্র রক্ষার জন্য একটু বেশি রকম উৎসাহ তোমার।"

পর্দাটা আবার উড়ল। পূরবীর মুখটা টেনে নামাবার চেষ্টা করছে প্রতুল। তপতী গলা খাঁকারি দিয়ে এগিয়ে এসে ঘরের বাইরে থেকেই বলল, "কাগজটা দেবে নাকি পূরবী।"

খবরের কাগজটা পর্দার ফাঁক দিয়ে বাড়িয়ে দিতেই তপতী বলল, "ঠাকুরপোর সঙ্গে একটা কথা ছিল।"

পূরবী পর্দা তুলে ধরতেই প্রতুল বিছানায় উঠে বসল। ভূমিকা না করেই তপতী বলল, "ব্রজেন এসেছিল আজ।"

"কে ব্রজেন!"

"ঠাকুরজামাই।"

"হঠাৎ! এতদিন পর কি মনে করে?"

"আবার বিয়ে করবে, তাই ডিভোর্স চায়।"

"অ।" প্রতুল কোলের উপর বালিশ টেনে নিল। "এতদিন করেনি কেন!"

এত সহজভাবে কথাটা নেবে তপতী আশা করেনি। একটু দমে গেল সে। "কিন্তু ডলির কি হবে তাহলে?"

"কি আবার হবে, যেমন দিন কাটছে তেমনি কাটবে। রবি তো আর নেই, তাহলে নয় ওকেই বিয়ে করতে পারত। অবশ্য সে ধুরন্ধর ছেলে, সময় বুঝেই কেটে পড়েছে।"

"এ বাড়িতে তো মেয়েদের চরিত্র রক্ষার দিকে খুবই নজর, তাহলে এমন হল কেন!" তির্যকস্বরে পূরবী দুজনকে উদ্দেশ করেই বলল।

"এ বিয়েতে আমার আপত্তি ছিল," প্রতুল গম্ভীর হয়ে গেল। "দাদাই উদ্যোগী হয়ে, পাত্র ঠিক করে সব কিছু করল, আমাকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করেনি। আমিও যেচে কিছু বলতে যাইনি। এখন ডিভোর্সের ব্যাপারেও আমি জড়াতে চাই না। যে বিয়ে দিয়েছে সে-ই বুঝুক।"

তপতী ভেবে পাচ্ছে না এবার কি বলবে। এটুকু বুঝেছে, সব ঝক্কি নিখিলের ঘাড়ে চাপিয়ে প্রতুল দায়মুক্ত থাকতে চায়। একটি পয়সাও ডলির হয়ে মামলা চালাতে খরচ করবে না।

"তাছাড়া এসব মামলা লড়ে কি লাভ?" পূরবী ভারিক্কি স্বরে বলল, "আইনের বাঁধন দিয়ে কি মনের ফাটল জোড়া যায়? তার থেকে আলাদা হয়ে যাওয়াই ভাল।"

"তা তো হল, কিন্তু সারা জীবন ওকে খাওয়াবে পরাবে কে?" তপতী উদ্বিগ্ন চোখে দুজনকে লক্ষ্য করল। ওরা দৃষ্টি বিনিময় করে নিরুত্তর রইল।

"ডলি তো শুধু একা ওঁরই বোন নয়।" তপতী বলল।

জবাব খোঁজার জন্য পূরবীর মুখের দিকে প্রতুল তাকাল।

সম্ভবত স্পষ্ট কোন নির্দেশ না পেয়ে সে বলল, "আমি ওকে ঘাড়ে নিতে পারব না এখনি জানিয়ে রাখছি। তবে মাসে মাসে কিছু দিতে পারি। ও বরং তোমাদের কাছেই থাক।"

কথা বলে আর কোন লাভ হবে না। তপতী ফিরে এল নিজের ঘরে। ডলির জন্য এখন তার দুঃখ হচ্ছে। বেচারা, ভালবেসে নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরেছে। কোথাও আর দাঁড়াবার জায়গা নেই ওর। অনুগ্রহের উপরই বাকি জীবনটা চলবে। নিজেকে ডলির জায়গায় কল্পনা করে শিউরে উঠল সে। মনে মনে বলল, আমি হলে কখনো এমন ভুল করতাম না। বিয়েই করতাম না। কিংবা বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে আগেকার পাট চুকিয়ে দিতাম, তারপরও জের টানতাম না। এ ছাড়াও তপতী ভাবল, রুবি সম্পর্কে আরো কড়া হতে হবে।

রাত্রে নিখিল যখন খাটে শুয়ে কাগজ পড়ছে, কালীমোহনের চিঠিটা তপতী ওকে পড়তে দিল। যা ভেবেছিল প্রায় সেই রকম-ভাবেই নিখিল উঠে বসল, কয়েকবার চিঠিটা এবং তার মুখের দিকে তাকাল। তপতীই অবশেষে বলল, "ব্যাপার বুঝছি না। বিমান-মামার উইলের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? ওর উইল জেনে আমি কি করব?"

জবাব না দিয়ে নিখিল শুয়ে আবার কাগজটা মুখের উপর তুলে ধরল। তপতীর মনে হল, ও আর পড়তে পারছে না।

"হয়তো উইলে তোমায় কিছু দিয়েছে।"

"কি আর আছে ওর দেবার মত!" তপতী ভরসা পেল না বলতে, বিমানমামার একটা বাড়ি আছে।

নিখিল কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, "রোববার জমির পীলারটা দেবার ব্যবস্থা করে এলাম। সকালে গিয়ে, দাঁড়িয়ে করাতে হবে।"

খাপছাড়াভাবে তপতী বলল, "ঠাকুরপো রাজী নয় ডলির হয়ে মামলা লড়তে। ওর কোন ভার নিতেও রাজী নয়।"

"জানতুম।" নিখিলের অন্যমনস্ক জবাব তপতীর কানে ধরা পড়ল। আন্দাজ করল, কালীমোহনের চিঠিটিই এর হেতু।

"এই রোববার বিকেলে চলো না। জেনেই আসা যাক ব্যাপারটা কি!"

"দেবার মত কিছু কি আর আছে, সব তো উড়িয়ে শেষ করেছে।" কাগজটা নামিয়ে তপতীর মুখে সোজা তাকিয়ে নিখিল বলল।

"বাড়িটা তো আছে এখনো।" হঠাৎ তপতীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল কথাগুলো।

"হুঁ।" নিখিলের মুখে চিলতে হাসি ফুটল অবিশ্বাসের। "বাড়ি একটা দামী জিনিস! সেটা কি ওমনি ওমনি কেউ বাইরের কাউকে দেয়! তোমার বিমানমামার জ্ঞাতিরা রয়েছে না? দিলে তাদেরই দেবে। তোমাকে দেবার কোন যুক্তিই নেই।"

তপতী অপ্রতিভ হয়ে বলল, "আমি কি বলেছি যে বাড়িটা আমায় দিয়ে গেছেন উইলে? সব উড়িয়ে দিয়েছে বললে, তাই বললুম বাড়িটা এখনো রয়েছে।"

নিখিল মুখ ফিরিয়ে মুচকি হেসে বলল, "নিশ্চয় মনে মনে বাড়িটার কথাই ভেবেছ। থালা-বাসনও তো আছে।"

তপতী রাগ দেখিয়ে বিছানায় উঠে দেওয়ালের দিকে ফিরে শুয়ে গজ গজ করে বলল, "উইল করে বাসন-কোসন কেউ দেয় না, দামী জিনিসই দেয়।"

"কেন দেবে?"

পাখার একটানা গুঞ্জন শুনতে শুনতে তপতীরও মনে হল, কেনই বা তাকে দেবে! আলো নিভিয়ে নিখিল শুয়ে পড়তেই সে বলল, "প্রদীপ আসেনি আজ, খোঁজ নিও তো কেন এল না।"

নিখিল "উঃ" বলে পাশ বালিশটা জড়িয়ে জড়ানো স্বরে বলল, "একটা বাড়ি পেয়ে গেলে মন্দ কি!"

"তাহলে কষ্ট করে টাকা জমিয়ে জমিয়ে আর বাড়ি করতে হয় না।"

নিখিল জবাব দিল না। বিষয়টাকে সে যেন গ্রাহ্যের মধ্যে আর ধরছে না। তপতী আবার বলল, "এই ঘরটায় কুড়ি বছর ধরে বাস

করছি, ভাবলে আশ্চর্য লাগে। এমন অভ্যেস হয়ে গেছে, এখন অন্ধ হয়ে গেলেও চলাফেরা করতে অসুবিধে হবে না।”

রাস্তার আলোর একটা টুকরো দেয়ালে এসে পড়েছে। তপতী অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সেখানে। ঠিক ওই জায়গাটিতেই নোনা লেগে বালি খসে গেছে। হঠাৎ তার মনে হল, দেয়ালের ওইখানটা পোড়া চামড়ার মত কুঁচকে বীভৎস দগদগ করছে। কুড়ি বছরে বহুবার এই ঘর কলি হয়েছে, দরজা জানালায় রঙ হয়েছে। তখন তার মনে হতো নতুন ঘরে উঠে এসেছি। তারপর কোন ফাঁকে পুরনো হয়ে যায় একটু একটু করে, বোঝা যায় না ঘরটারও বয়স বাড়ছে। ঠিক ওই জায়গাটায়ই প্রত্যেকবার বালি খসে। কিন্তু কোন দিনই মনে হয়নি, একটা ঝলসানো মানুষের মুখ ওখানে দেখা যাবে।

তপতী চোখ বন্ধ করল। সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে ফুটে উঠল আর একটা মুখ। কাল্পনিক নয়। কয়েক ঘণ্টা আগে দেখা। একটা চোখ গলে গেছে, অন্য চোখে তার দিকে তাকিয়ে। চাহনিতে কি যেন রয়েছে, বোঝা যাচ্ছে না। উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে তপতী তখন নিজেকে বোঝাতে শুরু করল : ওই মুখটা একটা দেয়াল ছাড়া আর কিছু নয়। এ রকম দেয়ালের ঘর আবার কলি আর রঙ করলেই নতুন হয়ে যায়। নিখিলকে কালই বলতে হবে, ঘরটা পুরনো-পুরনো লাগছে।

॥ পাঁচ ॥

নিখিল হাত বাড়িয়ে দিল উইলটা নেবার জন্য। কালীমোহন হাত তুলে দেবার সময় বললেন, “কেন জানি আমার মন বলছিল বিমান আর বাঁচবে না। ও নিজেও বুঝেছিল, তাই তাড়াতাড়ি উইল করল। কিন্তু এত শিগ্‌গিরী যে চলে যাবে ভাবিনি।”

ঘরের সব ক’টা চোখ এখন নিখিলের উপর। নিখিলের চোখ

টাইপ করে করে অক্ষরগুলো ডেমি কাগজের উপর যেন বসিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে থামছে, ভ্রূ কুঁচকে উঠছে, আবার বাক্যের শুরুতে ফিরে আসছে।

"আমিও অবাক হয়ে গেছলাম।" কালীমোহন হাসলেন তপতীর দিকে তাকিয়ে "ভাবতেই পারিনি শেষে তোকেই দিয়ে যাবে বাড়িটা।"

তপতীর চোখের সামনে তখন সব কিছু দুলছে। ও যথাসাধ্য চেষ্টা করছে নিখিলের, রুবির, শোভার, সোনা এবং রূপোর মুখগুলো অটুট অবস্থায় দৃষ্টির মধ্যে রাখতে। কিন্তু পারছে না। মুখগুলো ফেঁপে উঠেই আবার চুপসে যাচ্ছে।

"জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বিমান জবাব দেয়নি, শুধু বলেছিল, আমার খুশি। বরাবরই একগুঁয়ে তাই আর সাহস হল না কথা বাড়াতে।"

আমার মন বলেছিল, কেন জানি বাড়িটার কথাই মন বলেছিল। আশ্চর্য! তপতী চোখ বন্ধ করে নিজেকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করল। অদ্ভুত একটা কান্না ফেঁপে উঠছে তার মধ্যে। বাড়ি পাওয়ায়, কি বিমান মৈত্র মারা যাওয়ায়, বুঝতে পারছে না। তবে এখন একাকী কোথাও বসে থাকতে পারলে ভাল হয়। কান্নাটা শরীর থেকে বার করে না দেওয়া পর্যন্ত স্বাভাবিক হতে পারবে না।

"অদ্ভুত ভাগ্য বটে তপুর। এই বাজারে একখানা বাড়ি পাওয়া, কলকাতার ওপর!" কালীমোহন আধ ঘণ্টা আগে বাল্যবন্ধুর জন্য ডুকরে কেঁদেছিলেন তপতীকে দেখা মাত্রই। এখন হেসে উঠলেন। নিখিলের পড়া হয়ে গেছে। উইলটা সে এগিয়ে দিল কালীমোহনের দিকে। মুখে চাপা উত্তেজনা। তপতীর দিকে তাকিয়ে হাসলও।

"তোমার কাছেই রাখ, আমি রেখে কি করব আর। আমার কাজ তো শেষ হয়ে গেল।" কালীমোহন বললেন। একটু ইতস্তত করে উইলটা খামে ভরে নিখিল পকেটে রাখল।

এতক্ষণ শোভা একটাও কথা বলেনি। চৌকির একধারে বসে

রুগ্ন চোখে যাবতীয় ব্যাপার দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে ক্লান্ত হয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে দিচ্ছিল। হঠাৎ খাপছাড়াভাবে বলল, "ওনার তো আত্মীয়স্বজনরা আছে, তাদের বঞ্চিত করে যাওয়া ঠিক হয়নি।"

কালীমোহন বিরক্ত হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। "আছে তো কি হয়েছে! তাদের সঙ্গে বিমানের কোনদিনই ভাল সম্পর্ক ছিল না। একবার যাকে দেবার ইচ্ছে হয়, তাকে দেবেই। ঝোঁক পড়লেই হল।" একটু থেমে কথাগুলিকে প্রমাণ দ্বারা জোরালো করার উদ্দেশ্যে তিনি আবার জুড়লেন, "কমলা নামে থিয়েটারের এক হিরোইনকে নিয়ে বছর দুয়েক কি পয়সাটাই না ওড়াল। তাকে বাড়ি করে দিল পর্যন্ত। আজ থেকে আঠারো-কুড়ি বছর আগের কথা। বলতে গেলুম, বিমান বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে। অমনি ধমকে উঠল, কার জন্য রেখে যাব? কতকগুলো পাজি বদমাস আত্মীয়ের পেটে যাওয়ার থেকে যারা আমায় সুখ আনন্দ দিচ্ছে তাদের দিয়ে যাওয়া অনেক ভাল।"

"তপু ওকে আবার কি সুখ আনন্দ দিল?" শোভার তীক্ষ্ণ স্বরে এমন এক ধরনের বিস্ময় প্রকাশ পেল যাতে সারা ঘর হঠাৎ অস্বস্তি অনুভব করল। "উনি তো যেসব মেয়েমানুষ রেখেছিলেন তাদেরই একটা করে বাড়ি করে দিয়েছেন। তুমি তো পরশুই বললে—" শোভা হঠাৎ থেমে গেল। কালীমোহন ফ্যাল ফ্যাল করে স্ত্রীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে নিখিলের মুখে চোখ রাখলেন। নিখিল রুবির দিকে তাকিয়েই আড়ষ্ট হয়ে গেল। দুই মামাতো বোনের থেকে শুরু করে একে একে তপতী সকলের চোখে অপ্রতিভতা লক্ষ্য করল।

"তপু যেন বাক্সে করে কি আনল দেখলাম, সন্দেশ?" কালীমোহন একটু বেশি রকম লঘু হবার চেষ্টাই করলেন, যেটা তাঁর বয়সের পক্ষে খুবই বেমানান। "দে তো গোটা কয়েক আমাকে।"

"তোমার তো মিষ্টি খাওয়া বারণ," সোনা বলল।

"একদিন খেলে কিছু হবে না। তুই আন, আর এদেরও দে।

জানো বাবাজী, আমি ঠিক করে রেখেছিলাম, সেই ছোটবেলার মত কান ধরে তপুকে গোটা কতক চড় মারব প্রথমে। এ সব খবর হঠাৎ দিতে নেই। একটা শক পাওয়ার মত ব্যাপার তো। সুখবর সইতে না পেরে অনেকেই তো হার্টফেল করেছে। একবার এক সাহেবের আর্দালির কাছে রেঞ্জার্সের ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়ার চিঠি আসে, ইংরিজী চিঠি,—তাই সাহেবকে পড়তে দিল। চিঠি পড়ার পরই সাহেব তাকে কষে লাথি মারতে শুরু করে। যখন প্রায় আধমরা তখন বলল, ব্যাটা তুই লাখ টাকার মালিক হয়েছিস। এইভাবেই প্রথমে একটা শক্ দিয়ে পাল্টা শকের ধাক্কা সামলাতে হয়।"

কালীমোহন হাসতে লাগলেন। নিখিল চেষ্টা করল হাসবার। তপতীর মনে হল রুবি যেন তাকে লক্ষ্য করছে। প্রদীপ আর আসেনি। নিখিলকে সে জানিয়েছে, পঞ্চাশ টাকার একটা টিউশনি পেয়েছে, তবে খবর দিলে রুবিকে পড়া বুঝিয়ে দিয়ে যেতে পারে। তা সত্ত্বেও রুবিকে বাড়িতে রেখে আসার ভরসা হয়নি তপতীর। হয়তো সেই ফাঁকেই প্রদীপের সঙ্গে দেখা করতে বেরোবে।

রুবি অনিচ্ছা নিয়ে, মায়ের চাপে পড়ে এসেছে। কিন্তু এখন তপতী ওর চাহনির মধ্যে রাগ বা বিরক্তির বদলে কৌতূহল দেখতে পাচ্ছে। এ কৌতূহল কিসের? মামীমা হঠাৎ এমন কথা বলল কেন?

"মেয়ে তো বেশ সুন্দরী হয়েছে। বিয়ের সম্বন্ধ দেখছিস?" শোভা আবার খাপছাড়াভাবে প্রশ্ন করল।

"এখন কি, পড়াশুনো করছে করুক।" তপতী মৃদুস্বরে নিরুৎসুক উত্তর দিল।

"এরা যদি লেখাপড়াটাও শিখত।" শোভা হতাশ গলায় সোনা-রূপোর দিকে তাকাল। "ছেলেদের একজনও তো মানুষ হল না। কি যে হবে কে জানে।"

কালীমোহন হঠাৎ ব্যগ্র হয়ে নিখিলকে বললেন, "জানো, বিমান একবার বলেছিল, তপুকে ওর বাবা কিছুই দিল না। কিন্তু সব

সম্পত্তি দান করে দিয়ে মেয়েকে কেন বঞ্চিত করল তা আমি জানি। শুনে জানতে চাইলুম, কেন বঞ্চিত হল তপু? কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বলল, আচ্ছা দেখা যাক। আমার আর তারপর সাহস হল না কিছু জিজ্ঞাসা করার। ভীষণ রাশভারি ছিল তো!"

"আমি অবশ্য শ্বশুরের সম্পত্তির প্রত্যাশী নই। নিজের ক্ষমতা দিয়ে যা অর্জন করব, তাই ভোগ করব। তাতেই আমার সুখ, আনন্দ।" নিখিল রাশভারি হবার জন্য গলার স্বর মোটা করে বলল। তপতীর মনে হল, সুখ আনন্দ শব্দ দুটি নিখিল ব্যবহার করল যেন ইচ্ছে করেই।

কালীমোহন মাথা নেড়ে তারিফ জানিয়ে বললেন, "জানি জানি, তোমার সঙ্গে বিমানের চরিত্রগত অনেক মিল আমি লক্ষ্য করেছি। অনুগ্রহ তোমরা কেউই নিতে চাও না। একেই বলে পৌরুষ। নিজের ভাগ্য নিজের হাতে নিয়ে চলা! তবে এখন বাপু কিছু ঝঞ্ঝাট এই উইলের প্রোবেট নিতে পোয়াতেই হবে তোমায়। ভাগ্য এখন তোমায় নিয়ে খেলবে। অত টাকার একটা বাড়ির জন্য কত হাজার টাকার স্ট্যাম্প লাগে দেখো, তার ওপর কেউ অবজেকশান দিলে তো শুরু হয়ে গেল মামলা। তার মানে টাকার শ্রাদ্ধ।"

নিখিল স্মিতমুখে শুনে বলল, "আমার দু-একজন চেনা অ্যাডভোকেট আছে। তা ছাড়া ঝঞ্ঝাট কোন ব্যাপারে নেই বলুন। একটা জমি কিনেছি, তাতে পিলার দিলাম। গত রবিবার গিয়ে দেখি একটা পিলার উধাও। পাশের লোক যদি খানিকটা দখল করে নেয়, তখন তো উদ্ধার করতে ঝঞ্ঝাটে পড়তে হবে!"

"বাড়ি করছ? আর করা হল না তাহলে। সেই টাকাটাই দেখবে উইলের প্রোবেট নিতে বেরিয়ে গেছে।" কালীমোহন নিশ্চিন্ত স্বরে বললেন। শোনা মাত্র নিখিলের ভঙ্গি কঠিন হয়ে গেল। কালীমোহন সেটা লক্ষ্য না করে সোনাকে তাড়া দিলেন, "কি হল, সন্দেশ আনলি না? আজকের দিনে সবাই মিলে মিষ্টিমুখ হোক।"

"মামাবাবু, আমরা এবার যাব।" নিখিল আচমকা দাঁড়াল।

"আর একদিন এসে খেয়ে যাব, আজ একজনদের বাড়ি আমাদের যাওয়ার কথা, দেরি হয়ে গেছে।"

এরপর কালীমোহন কিছুক্ষণ ধরে অনুরোধ উপরোধ করেও টলাতে পারলেন না। রেকাবিতে সন্দেশ নিয়ে সোনা দ্রুত হাজির হল। খাওয়া শেষ করে ওরা যখন ট্রাম স্টপে এসে পৌঁছল, তখন ছুটির দিনের মন্থর ভিড় রাস্তায় জমে উঠেছে।

"আমাদের কোথাও যাওয়ার কথা আছে কি?" রুবি জিজ্ঞাসা করল। নিখিল আনমনার মত দূরে তাকিয়ে ছিল। রুবি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করায় বলল, "ভাল লাগছিল না, তাই বললাম।"

"আমারও ভাল লাগছিল না। দিদিমণি এমন সব কথা এমনভাবে বলে যে, শুনলে রাগ ধরে।" রুবি চোখে সহানুভূতি ও গলায় বিরক্তি নিয়ে তাকাতেই তপতী মুখ ঘুরিয়ে নিল। এতক্ষণ ধরে যে উত্তেজনা জমে উঠেছিল রুবির হাবেভাবে সেটা শরীর থেকে চুঁইয়ে বেরিয়ে যেতে শুরু করল। 'তপু, তোর যে লটারির ফার্স্ট প্রাইজের ভাগ্য!' বলে কালীমোহন অভ্যর্থনা জানানো মাত্র, যে কম্পন পা থেকে মাথা পর্যন্ত শুরু হয়েছিল এখন তার কিছুই অবশিষ্ট থাকছে না। যে কান্নাটা ভিতরে কেঁপে উঠেছিল সেটা স্তিমিত হয়ে জমাট বেঁধে যাচ্ছে। তপতী আবার তার মনের ভারসাম্য ফিরে পাচ্ছে।

"মা তো এখন একটা বাড়ির মালিক।"

রুবির গলায় উত্তেজনা রয়েছে শুনে তপতী ফিরে তাকাল। নিখিল শুনে হাসল এবং সিগারেট ধরাল।

"ট্রাম এসে যাবে আর তুমি সিগারেট ধরালে।" রুবির কণ্ঠস্বরে গত সাত দিনের গাম্ভীর্য ও বিষণ্ণতা ঝরে যাওয়ার ইঙ্গিত প্রকাশ পাচ্ছে। তপতীর ভাল লাগল।

"সেলিব্রেট করছি। তোর মা-র উচিত আজ আমাদের খাওয়ানো।" নিখিলের দাঁড়াবার ভঙ্গিতে বয়সটা কুড়ি বছর পিছিয়ে যাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তপতীর মুখে হাসি ফুটল।

"আমি কি রোজগার করি যে, খাওয়াব? বরং আমাকেই তোদের

খাওয়ানো উচিত।"

"নিশ্চয়। তা হলে বাবাই খাওয়াবে, যেহেতু আমিও রোজগার করি না।"

নিখিল সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে মিটমিট করে ধোঁয়াটা অল্প অল্প বার করতে থাকল। কয়েকটি যুবক ট্রাম-স্টপে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা কথা বলতে বলতে রুবির দিকে তাকাচ্ছে। রুবি কাঁধের আঁচল গুছিয়ে নিল, কেননা নিখিল ভ্রূকুটি দিয়ে যুবকদের ধমকাবার চেষ্টা করছে। তপতীর হালকা লাগছে এখন। যানবাহন বা পথচারীদের দিকে তাকিয়ে তার ইচ্ছা করল না আর এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে। দেহের মধ্যে একটা প্রফুল্লতা দাপাদাপি করছে। সেটাকে বাগ মানাতে ইচ্ছে করছে না তার।

"ট্রামে বড্ড ভিড়। তার চেয়ে হেঁটে খানিকটা এগিয়ে যাই।" তপতী বলা মাত্র রুবি সমর্থন করল।

"তাই ভাল। আমার তো এখন বাড়ি ফিরতেই ইচ্ছে করছে না।"

"তাহলে কী ইচ্ছে করছে?" নিখিল আবার মিটমিট করে হাসল।

"ইচ্ছে করছে খুব ছুটতে, চেঁচাতে, গাইতে। ভাবা যায়, একটা আস্ত বাড়ি এমনি এমনিই আমরা পেয়ে গেলুম! জানো, ক্লাসের যে ক'টা মেয়ে নিজেদের বাড়িতে থাকে তাদের কি ডাঁট!"

"কালকেই তোর মায়ের নামে একটা লটারির টিকিট কিনব।"

"ঠাট্টা হচ্ছে!"

"মোটেই নয়। স্ত্রীভাগ্যে ধনলাভ, আমার কুষ্ঠিতেই তো লেখা আছে। আমাদের আগেকার পাড়ার শ্মশানেশ্বর ভটচাযের করা, ওর গণনা কোনদিনও ভুল প্রমাণ হয়নি। প্রত্যেকটা কথাই অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। মারা গেলেন তাই, নয়তো রুবির একটা কুষ্ঠি করিয়ে নিতাম ওকে দিয়ে।" বলতে বলতে নিখিলের চোখ-মুখ উদ্ভাসিত হল। আগেকার পাড়ার কথা বলতে গেলেই ওর বোধবুদ্ধি

হঠাৎ অপরিণত কৈশোর স্তরে নেমে যায়, উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তখন অবধারিত একটা কথায়, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এসে পৌঁছবেই— —"একসময় আমাদেরও একটা নিজস্ব বাড়ি ছিল। সেই বাড়িতে জন্মেছি, বড় হয়েছি। ভাড়া বাড়িতে তো আছি বছর পঁচিশ মাত্র।" নিজস্ব শব্দটির উপর একটু বেশি জোর দেয়। আর চোয়ালের পেশী কঠিন হয়ে আসে তখন।

"এইভাবে কতক্ষণ দাঁড়াব আর!" রুবি আদুরে গলায় বলল, "গড়ের মাঠে চল না তার চেয়ে। ফুচকা খাওয়া যাবে।"

নিখিল হাত তুলে একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে বলল, "চল্, একটা জিনিস দেখাব আজ তোদের। তোরা কেউ দেখিসনি।"

ট্যাক্সিতে রুবি বলল, "কি জিনিস দেখাবে?"

"আমাদের আগেকার বাড়ি।" নিখিল জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আরাম করে সীটে হেলান দিল। তারপর ড্রাইভারকে খুব সন্তর্পণে, অনুরোধ করার মত বলল, "দর্জিপাড়া।"

শোনা মাত্র তপতী আড়ষ্ট হয়ে গেল। নিখিল এখন পঁচিশ বছর আগের জীবনে ফিরে যাচ্ছে। একটু আগেই যে বিস্ময় আর উত্তেজনা ওকে যুবক করে তুলেছিল, এখন আর তা পাওয়া যাবে না ওর মধ্যে। নিখিল এখন প্রাচীন পোড়োবাড়ি হয়ে যাবে। শুধু পুরনো কথায় আর খেদে ভরে থাকবে বাড়িটা। বহুবার শোনা কথা। একটা আশ্চর্য নতুন ঘটনা ঘটে গেছে, তার প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ দেখার জন্য তপতী উৎসুক অথচ নিখিল চলেছে পুরনো একটা বিষণ্ণতার দিকে। বরং রুবিকেই এখন তপতীর ভাল লাগছে।

"দোতলার বড় ঘরটা তো বাবাই দখল করবে, ওটাই বেস্ট। সিঁড়ির পাশেই যে ঘরটা, ওটায় যদি সোফা-টোফা দিয়ে একটা বসবার ঘর করা যায়! আচ্ছা সোফা সেটের কত দাম? সুদীপ্তার বিয়েতে ওর বাবা শেয়ালদা থেকে কিনেছিল আড়াইশো টাকায়। কি সস্তা, তাই না বাবা?"

নিখিল অলস চোখে বাইরে তাকিয়ে। জবাব দিল না। রুবি অপ্রতিভ হয়ে তখন তপতীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "অনেকগুলো জানলা-দরজা, সব ক'টায় পরদা দিতে বেশ খরচ হবে।"

"দরকার হতো না পরদা দেওয়ার," নিখিল মুখ না ফিরিয়ে বলল, অনেকটা আপন মনেই। "বাড়ির চারধার ঘিরে টানা ঢাকা-বারান্দা, বাইরে থেকে বোঝা যেত না ঘরের ভিতর।"

"কোন্ বাড়ির কথা বলছ, বিমানদাদুর?" রুবি বলল।

"না, আমাদের দর্জিপাড়ার বাড়ির।"

"সে তো কবে বিক্রি হয়ে গেছে, এখন আর আমাদের বলছ কেন!"

নিখিলের মুখে দুঃখ পাওয়ার ছাপ ফুটে উঠল। তপতীর মনে হল, এ ছাপ ততদিনই থাকবে, নিজস্ব একটা বাড়ি না হওয়া পর্যন্ত; কিন্তু আজ উচিত সেই চিন্তা থেকে নিখিলের রেহাই নেওয়া।

"এখন তো ভাড়াটেতে গিজগিজ করছে। পুরনোদের অনেকেই মরে গেছে, উঠে গেছে পাড়া থেকে। এখন পাশের বাড়ির লোকেরই নাম বলতে পারে না।"

"কি দরকার ছিল বিক্রি করার?" রুবি ক্ষুব্ধ স্বরে বলল। নিখিল চুপ করে থাকল। তারপর একসময় ড্রাইভারকে বলল, "ব্যস, এখানেই।"

ট্যাক্সি থেকে নেমে চওড়া রাস্তা দিয়ে কিছুটা এগিয়ে একটা গলিতে ঢুকে তিনটে বাঁক ফিরে নিখিল দাঁড়িয়ে পড়ল। "ওইটে" আঙুল তুলে সে বলল, "আমাদের বাড়ি।"

রুবি আর তপতী একটা পুরনো বাড়ির দিকে তাকাল। দু' মানুষ উঁচু সদর-দরজার পাল্লা দুটোয় গজাল আঁটা। দরজার পরই দু' পাশে ছোট রক, তারপরই উঠোন। কয়েকটি স্ত্রীলোক উঠোনে বাসনমাজা কাপড়কাচা, কল থেকে জল নেওয়ায় ব্যস্ত। দোতলায় টানা বারান্দা বাড়িটাকে বেষ্টন করে। মাঝে মাঝে কাঠের পার্টিশান দিয়ে ভাগ করা। বারান্দার রেলিংয়ে নানা রকম বস্ত্র

ঝুলছে। তিনতলা থেকে নেমে আসা বৃষ্টি-জলের পাইপটা মাঝখানে ভাঙা, ছড়ছড় করে জল পড়ল। দোতলার একটা ঘরে তুমুল ঝগড়া চলেছে।

নিখিল বিরক্ত হয়ে দোতলার দিকে তাকাল। আপন মনেই বলল, "কি করে ফেলেছে বাড়িটাকে। জানোয়ার, জানোয়ার এই ভাড়াটেরা।"

"আমরাও তো ভাড়াটে।" রুবি ভর্ৎসনা করল চোখ এবং ভ্রূ-তে ঠোকাঠুকি করে।

নিখিলকে বিব্রত দেখাল। তপতী চিমটি কাটল রুবিকে। "এভাবে বলিসনি, উনি দুঃখ পাবেন।"

"এই বারান্দার পিছনেই একটা খুব বড় ঘর আছে, হলঘর। ঠাকুরদা বসতেন। ঝাড় ছিল, ফরাস ছিল, মেঝেটা শ্বেতপাথরের বরফি নকশা করা, দেয়াল ফিকে সবুজ ডিস্টেম্পার করা, তাতে আঁকা ছিল থোকা থোকা আঙুর।" নিখিল দূর থেকেই আঙুলটা সন্তর্পণে বাড়ির গায়ে বোলাতে লাগল।

একতলায় সদরের পাশের ঘরের জানলা থেকে একটি লোক ওদের লক্ষ্য করছিল। বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করল, "কাকে খুঁজছেন?"

নিখিল উত্তর দিতে ইতস্তত করছে। রুবি তাড়াতাড়ি বলল, "আমাদের বাড়ি দেখতে এসেছি।"

রুবির কথার অর্থ বোঝবার চেষ্টা করতে গিয়ে লোকটি হাত তুলে বগল চুলকোতে লাগল। নিখিল ব্যস্ত হয়ে পরিষ্কার করে দিল, "বাড়িটা একসময় আমাদেরই ছিল।"

"বেচে দিয়েছেন?"

"বাবা বিক্রি করেছেন।"

"বেচবার আর লোক পেলেন না! বেশি ভাড়ার লোভে অবাঙালি ভাড়াটে বসাচ্ছে বাঙালি তুলে দিয়ে। শুধু কি তাই," গলাটা নামিয়ে ফিসফিস করে লোকটি বলল, "প্রেস্‌ও বসিয়েছে, হ্যাঁ, আমার পাশের ঘরেই।"

"সে কি!" নিখিল আহত স্বরে বলে উঠল, "এই বাড়িতে?"

"তবে আর বলছি কি মশাই! অবশ্য একেবারে বাজারের নয়, এই হাফ-গেরস্ত টাইপ। আরও ঠিক করে বললে, একজনের কেপ্ট।" গলাটা একটু উঠে গেছল, নিখিলকে আড়চোখে রুবি ও তপতীর দিকে তাকাতে দেখে লোকটি আবার ফিসফিসিয়ে বলল, "মশাই, বিধবা, একটা ছেলেও আছে, স্কুলের মাস্টারনী, বয়স হবে—" এধার-ওধার তাকিয়ে হঠাৎ তপতীর দিকে থুতনী তুলে বলল, "এই ধরুন, ওর মত কি দু-চার বছর হয়তো কমই হবে। লোকটা প্রায়ই আসে। এলেই ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। কেন রে বাবা? একদিন দরজা খোলাই ছিল, আমার ছোট মেয়েটাও তক্কে তক্কে ছিল, দেখে ফেলল দু'জনকে —থাক, সে সব কথা, আপনি ভদ্রলোক, আপনাকে আর বলা যায় না মশাই। তবে একটা কথা কি জানেন, ছোট ছোট মেয়েরা যদি এই সব দেখে, তা হলে কি তাদের ক্যারেকটার বলে কিছু থাকবে? এই করেই তো বাঙালি জাতটা উচ্ছন্নে গেল।"

লোকটি আচমকা স্থানত্যাগ করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। নিখিল ওর গমনপথের দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকার পর মুখ ফিরিয়ে পিছনে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তপতী আর রুবি রকে পা ঝুলিয়ে বসে।

"একি! এভাবে বসে! তুমি এ-বাড়ির বউ সে কথা ভুলে গেছ?"

চটপট দু'জনে উঠে দাঁড়াল। তপতী অপ্রতিভ হয়ে বলল, "এ-বাড়ি তো এখন অন্য লোকের, আর এখানকার কেই-বা আমায় চেনে।"

"তোমায় না-চিনলেও, আমাকে তো চেনে। পাঁচ-পুরুষ আমরা বাস করেছি এ-পাড়ায়। যে চালে চলাফেরা করেছি সেই চালেই এ-পাড়ায় চলব।" কথাগুলো তীক্ষ্ণ এবং দ্রুত হয়ে ধমকের ভঙ্গিতে নিখিলের মুখ থেকে বেরিয়ে এল। অপ্রতিভতা কাটাবার জন্য তপতী মুখ ফিরিয়ে রাস্তার শেষ প্রান্তে তাকাল।

পরনে কালোপাড় সাদা শাড়ি, আঁটসাঁট চেহারার শ্যামবর্ণা

একজন আসছে। ডান পা-টি একটু ছোট, তাই ডান দিকে দুলে দুলে হাঁটছে। হাতে ছোট একটি ব্যাগ। তপতীর যেন চেনা মনে হল। স্ত্রীলোকটিও তপতীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আসছে। ওর চোখেও দ্বিধাগ্রস্ত পরিচিতের আভাস। তপতীর হাত পাঁচেক দূরে পৌঁছে একটু থমকে চেনার চেষ্টা করল।

"যেন চেনা লাগছে।" তপতীই প্রথম শ্যামবর্ণাকে উদ্দেশ করে বলল।

"আমারও তাই—আচ্ছা তুই তপু না ?"

"তুই বাণী !" তপতী দু' হাতে জড়িয়ে ধরল ওকে। নিখিলের দিকে তাকিয়ে বলল, "মামারবাড়ির পিছনের বাড়িতে থাকত। উঃ, কতদিন পর কেমনভাবে দেখা হয়ে গেল আবার।"

"তোর বিয়ের পর দু'-একবার দেখা হয়েছিল মাত্র, যখন মামার-বাড়ি আসতিস। তারপর আসা ছেড়ে দিলি আর আমারও—এই বুঝি তোর মেয়ে ?" বাণী প্রথমে রুবির তারপর নিখিলের দিকে তাকিয়ে, হাত তুলে নমস্কার করল। একটা হাত মুঠো করে গলা পর্যন্ত উঠিয়ে, ভারিক্কি চালে মাথা হেলিয়ে, নিখিল তাড়াতাড়ি প্রতি-নমস্কার জানাল।

"আমাকে আপনি তখন দেখেছেন, তবে এত অল্প যে মনে না থাকারই কথা।" বাণী হাসল। ওর ঝকঝকে দাঁতের সারি থেকে নিখিল চোখ সরিয়ে সিঁথিতে রাখল। সিঁদুর নেই। এত বয়সেও বিয়ে হয়নি, নাকি বিধবা, এই কৌতূহলে আচ্ছন্ন হলেও সৌজন্য সহকারে সে বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার কথা বলত বটে।"

"তপুকে কিন্তু প্রথম দেখেই চিনেছি। তবে যা মোটা হয়েছে, একেবারে গিন্নিও না হয়ে—"

"আমারও চেনা লাগছিল তোর চলন দেখে।" তপতী তাড়াতাড়ি বলল, কথা ঘোরাবার জন্য। "এ-পাড়ায় কি জন্য ?"

"এখানেই তো থাকি। স্কুলে পড়াই, এখান থেকে স্কুলটা কাছে হয় বলে উঠে এসেছি মাস ছয়েক। এই তো, এই বাড়িটায়।" বাণী

আঙুল দিয়ে নিখিলের পৈতৃক বাড়িটা দেখাল। "আমি আর আমার ছেলে।"

"ওমা, এটা তো একসময় আমার শ্বশুরের বাড়ি ছিল!"

"তাই বুঝি। আয়, ঘরে এসে বোস। এত বছর পরে দেখা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি কথা বলা হয়। কত গল্প যে জমে আছে, নিখিলবাবু আসুন, দেখেছেন আপনার নামটা ঠিক মনে আছে। তুমিও এসো, কি নাম তোমার?"

"রুবি।" এতক্ষণ একধারে দাঁড়িয়ে রুবি তার মায়ের বাল্যবন্ধুকে শুধু লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। স্কুলের যত দিদি দেখেছে ঠিক তাদের মতই। উচ্চারণ গোটা-গোটা, বলার ভঙ্গি ঝরঝরে। শাড়ির ভাঁজগুলো সাজানো, চুল টেনে বাঁধা, কিন্তু মুখে কেমন যেন ছেলেমানুষী ভাব মাখানো। রুবির আরও মনে হল, মায়ের এই বাল্যবন্ধুটির দেহের গঠন যেন তার মনে ঈর্ষার উদ্রেক করছে। দশ-পনেরো বছর বয়স অনায়াসেই এই দেহ চুরি করে রাখতে পারে।

"আচ্ছা, আপনি কি একতলায়, ডান দিকের কোণের ঘরে থাকেন?" নিখিল ধীর, গম্ভীর স্বরে বলল।

"হ্যাঁ, জানলেন কি করে!" বাণী আশ্চর্য হল।

"এমনিই বললাম। আচ্ছা আর একদিন আসব, আজ এক জায়গায় যাচ্ছিলাম, অলরেডি দেরি হয়ে গেছে।" নিখিল হাতঘড়ি দেখে তপতীর মুখের দিকে তাকাল। ওর চোখ দেখে তপতী বুঝল এটা হুকুম, মান্য করতেই হবে। অনুনয় করেও কোন লাভ হবে না। ক্ষোভ আর হতাশা চেপে সে বলল, "হ্যাঁরে বাণী, দেরি হয়ে গেছে, আজ আর বসতে পারব না। আর একদিন আসব বরং, তুইও তো যেতে পারিস।"

"তোর ঠিকানাই তো জানি না।"

রুবি সঙ্গে সঙ্গে ঠিকানা বলল। ব্যাগ থেকে কলম আর এক টুকরো কাগজ বার করে বাণী লিখে নিল। নিখিল ততক্ষণে এগিয়ে গিয়ে অধৈর্যতার ভান করে ঘড়ি দেখতে দেখতে তাকাচ্ছে।

"যাব একদিন।" বাণী ঘাড় নেড়ে হাসল।

ওরা কাছে আসা মাত্র নিখিল বিরক্ত হয়ে বলল, "রাস্তায় দাঁড়িয়ে অত হাসাহাসির কি দরকার!"

"কোথাও তো যাবার দরকার নেই, তা হলে বসলে না কেন একটু।" তপতী তার ক্ষোভ বার করতে শুরু করল। "এতদিন পর দেখা হল, আর অমনি তোমার—এই এক স্বভাব, বরাবরই দেখে আসছি।"

"কারণ নিশ্চয় আছে।" নিখিল রূঢ় স্বরে বলল, "তোমার এই বন্ধুটির চরিত্র সম্পর্কে যা শুনলাম, তাতে ওর ঘরে না যাওয়াই উচিত।"

রুবি এবং তপতী দু'জনেই বিস্মিত হয়ে কিছু একটা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, তার আগেই নিখিল থুত্থুরে এক বৃদ্ধকে একটি বাড়ির জানালায় দেখে এগিয়ে গিয়ে বলল, "হরিকা, চিনতে পারেন?"

বৃদ্ধ চোখ-মুখ কুঞ্চিত করে নিখিলকে ঠাওর করার চেষ্টা শুরু করল। নিখিল ইতস্তত করে বলল, "আমার নাম নিখিল, অক্ষয় মিত্তিরের নাতি আমি।"

"অ।" বৃদ্ধ এই শব্দটুকু করে একইভাবে তাকিয়ে রইল। নিখিলের মুখ নিষ্প্রভ হয়ে এল। আড়চোখে একবার রুবি-তপতীর দিকে তাকিয়ে নিল সে।

"আমি পল্টু মিত্তিরের ছেলে।"

"অ, পল্টুর ছেলে।" বৃদ্ধের মুখে পরিচয়ের আভাস দেখা দিল। "বাপের মতই লম্বা হয়েছ দেখছি। কর কি?"

নিখিল নিচু গলায় কি বলল। শুনেই বৃদ্ধ গলা চড়িয়ে বলল, "ভাল, ভাল, সুপারিনটেনের কাজ তো খুব বড় কাজ।"

ফ্যাকাসে মুখে নিখিল আবার রুবি-তপতীর দিকে আড়চোখে তাকাতেই মুখ ঘুরিয়ে নিল তপতী।

"থাকো কোথায় এখন?"

"শোভাবাজারে, তবে দমদমে বাড়ি করছি, শীগগিরই উঠে যাব।

শ্যামপুকুরেও একটা বাড়ি আছে কিন্তু সেটা নিয়ে এখন বেশ কিছুদিন হাইকোর্ট করতে হবে। সম্পত্তি থাকার এই এক ঝামেলা, করা সোজা, রাখা শক্ত।" বলতে বলতে নিখিল মুখের রক্তাল্পতা ঘুচিয়ে নিল অনেক পরিমাণে।

"তা বটে। তোমার বাবাকেই দেখ না, বসে বসে শুধু উড়িয়েই গেল, বাড়িটা পর্যন্ত রাখতে পারল না। পাওনাদাররা জোঁকের মত ছেঁকে ধরত। আর তোমাকেই তো মিথ্যা বলে বলে ওদের ফেরাতে হতো, তাই না ?"

"বাবা, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে না ?" রুবি চাপা গলায় নিখিলকে যেন পালাবার পথ দেখিয়ে দিল।

"আচ্ছা চলি হরিকা, একজনের বাড়ি যাওয়ার কথা, দেরি হয়ে যাচ্ছে।" নিখিল ধীরে পিছু ফিরে হাঁটতে শুরু করল।

তপতীর চোখে ধরা পড়ল, নিখিলের পিঠটা বাঁকানো, হাত দুটো দেহের দু' পাশে ঝুলে রয়েছে। বাড়ি পর্যন্ত বাকি পথ, রুবি এবং তপতী ওর পিছনে হেঁটে এল। পথে রুবি একবার তপতীকে বলেছিল, "এই বাড়ি দেখতে না এসে ওই বাড়িটা দেখতে গেলেই হতো।" তপতী কথার জবাব দেয়নি। তখন সে বুঝতে চেষ্টা করছিল, নিখিলকে কেন হঠাৎ নারায়ণ বলে মনে হয়েছিল সেদিন। একখণ্ড জমি আর তিন কোণে তিনটে পিলারের মাঝে তো এই দীন, অতি সাধারণ মানুষটাই দাঁড়িয়েছিল। ফলাও করে দেখবার মধ্যে, যার আছে শুধু বিগত বংশগৌরব, আর অতি কষ্টে কেনা তিন কাঠার একটি জমি। পিঠের দিকে যতবার সে তাকিয়েছে, মনে হয়েছে নিখিল খুবই সামান্য মানুষ। ওর চার দিকে চারটে পিলার বসানো, সীমানা দিয়ে বাঁধা পড়ে গেছে। আর হ্রাসবৃদ্ধি ঘটবে না। ওইটুকু চৌহদ্দির মধ্যে যতটুকু পৌরুষ দেখান যায়, দেখাতে দেখাতে একদিন ও শুয়ে পড়বে।

বাড়ি পৌঁছে, ওরা তিনজন সবেমাত্র দোতলায় উঠে ঘরে ঢুকেছে, ডলি দরজায় এসে দাঁড়াল। পাঞ্জাবিটা আলনায় ঝুলিয়ে ফিরে তাকাল নিখিল।

"বউদি তোমায় বলেছে কি কথাটা ?" ডলি ভয়ে ভয়ে চোখ নামিয়ে রেখে বলল।

"কি কথা।" থমথমে মুখে নিখিল স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে, এক পা এগিয়ে এসে আবার বলল, "কি কথা। মামলা কনটেস্ট করতে হবে সেই কথা ?"

নিখিলের চোখ-মুখ দেখে তপতী চমকে উঠল। ডলির হাত কাঁপছে, ঢোঁক গিলল সে।

"কেন, আমি করব কেন ?" হঠাৎ চিৎকার করে উঠল নিখিল। পাশের ঘরে শাড়ি বদলাচ্ছিল রুবি। শায়া পরা অবস্থায়ই ছুটে এল। পূরবীদের ঘরে রেডিও বাজছিল, বন্ধ হয়ে গেল। নিখিলকে এত জোরে চেঁচিয়ে উঠতে, তপতী কুড়ি বছরে এই প্রথম শুনল।

'আমি আমি আমি, শুধু আমিই বলদের মত বইব সকলের বোঝা। ধার-দেনা করে একজনকে পড়াব, একজনের বিয়ে দেব, আবার এই আবদারও রাখতে হবে। আমি কি কুবেরের ধন নিয়ে বসে আছি, না যে যা অন্যায় করবে তা সমর্থন করার জন্য কোর্ট-ঘর করে বেড়াব ?"

"অত চেঁচাচ্ছ কেন, লোকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে যে।" তপতী এই বলে নিরস্ত করার চেষ্টা করল। তাতে যেন উলটো ফলই ফলল। নিখিল সমান জোরে চিৎকার করে বলল, "জানুক পাড়ার লোক। আমার বোনের কীর্তি জানুক। আমি মুখে রক্ত তুলে টাকা রোজগার করব আর সেই টাকা দিয়ে ওর ব্যভিচারের মাশুল গুণতে হবে। কেন, কেন আমি—" পাগলের মত নিখিল ঘরে পায়চারি শুরু করল।

"ঠাকুরঝি, তুমি নীচে যাও তো এখন।" তপতী ফিসফিস করে ডলিকে কথাগুলো বলে, মৃদু ঠেলা দিল। ডলির মুখটা পাথরের মত হয়ে গেছে। আর কথা না বলে সে নীচে নেমে গেল। রুবি বলল, "জানলাটা বন্ধ করে দাও মা, অনেকে দেখছে।"

জানলা বন্ধ করতে গিয়ে আলনায় ঝোলান পাঞ্জাবিটায় তপতীর

হাত ঠেকল। উইলটা পকেটেই রয়ে গেছে। কিন্তু এখন সেটা বার করে আলমারিতে তুলে রাখতে তার ভরসা হল না।

মাঝ রাত্রে, অন্ধকার ঘরে সিগারেট মুখে পায়চারি করছিল নিখিল। তপতী বলল, "শোবে না?"

জবাব দিল না নিখিল। অনেকক্ষণ পর খাটের কাছে এসে ঝুঁকে বলল, "তোমার মামীমা ওই কথাটা তখন বলল·কেন?"

"কোন্ কথা!" তপতীর দম বন্ধ হয়ে এল। নিখিল কি ভাবছে এখন সেটা বুঝতে পেরেছে।

"আত্মীয়দের না দিয়ে বাড়িটা তোমায় দিলেন কেন? যে সব মেয়েমানুষ ওকে সুখ-আনন্দ দিয়েছে তাদেরই বাড়ি দিয়েছেন, কিন্তু তুমি—" সোজা হয়ে নিখিল সিগারেটে টান দিয়ে আবার পায়চারি শুরু করল।

"কেন আমায় দিলেন সেটা তো আমিও বুঝতে পারছি না।" তপতীর স্বরে বিস্ময়ের বদলে চাপা ভয় ফুটে উঠল। নিখিলের মনের মধ্যে তবে কি কোন সন্দেহ ঢুকেছে? নয়তো হঠাৎ এইভাবে প্রশ্ন করবে কেন!

"কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে তা হলে কি জবাব দেব!" ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিখিল বলল। ওকে এখন কালো একটা জমাট অন্ধকারের মত দেখাচ্ছে। মুখে সিগারেটের জ্বলন্ত লাল বিন্দু। আবার কিছুক্ষণ পায়চারি করে সিগারেট শেষ হতে, রাস্তায় ফেলে দিয়ে নিখিল খাটে বসল।

"এভাবে না পেলেই ভাল ছিল।"

তপতী জবাব দিল না। তার মনে হচ্ছে এখন নিখিলকেই একা কথা বলতে দেওয়া উচিত। ও যেন কিছু বলতে চায়। সামনের বাড়ির ঘড়িতে একটা ঘন্টা বাজল। সাড়ে বারোটা, একটা, না দেড়টা বুঝতে পারল না তপতী। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে রইল সে নিখিলের কথা শোনার জন্য।

"কষ্ট করে জমি কিনলুম একটা বাড়ি করব বলে। এই পরিশ্রমের

তা হলে কি দরকার ছিল?" নিখিল নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল মাথাটা বুকের কাছে ঝুঁকে পড়ল ওর। কিছুক্ষণ এইভাবে থেকে হঠাৎ মুখটা কড়িকাঠের দিকে তুলে ধরল। "নিজের কৃতিত্বে গড়া জিনিস আর অনুগ্রহে পাওয়া জিনিস থেকে একই রকম সুখ পাওয়া যায় না। একটা ফাঁক থেকেই যায়।"

তপতীর মনে হল, বুকের মধ্য থেকে কথাগুলোকে নিখিল সুতোর মত টেনে টেনে বার করে তাই দিয়ে নিজেকে বাঁধছে।

"পুরুষমানুষের প্রমাণ তার কৃতিত্বে।" তপতী বলল।

"হ্যাঁ। কিন্তু আমার জন্য কৃতিত্ব দেখাবার আর কি রইল!" নিখিল ক্রুদ্ধস্বরে বলল, "আমার আর বয়স নেই যে নতুন করে কিছু করব।"

শুয়ে পড়ল নিখিল। তপতী কাছে সরে এসে ওর বুকে মাথা রাখল। একটা বড় নিঃশ্বাস নিখিলের বুক থেকে বেরিয়ে এল তপতীর মাথাটি দুলিয়ে দিয়ে। মৃদুস্বরে, সান্ত্বনা দেবার জন্য সে বলল, "তুমি অত ভাবছ কেন, কৃতী হবার সুযোগ জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও থেকে যায়।"

"কি জানি, হয়তো থাকে।" কাঠের মত শক্ত হয়ে নিখিল শুয়ে থাকল। তপতীর ভয় হচ্ছে, হুড়মুড় করে হয়তো নিখিল ভেঙে পড়বে একটা পোড়ো বাড়ির মত। সে দু' হাতে জড়িয়ে ধরল ওকে।

॥ ছয় ॥

রুবি পরদিনই বাড়িতে এবং পাড়ায় চাউর করে দিল খবরটা। ডলি এবং প্রতিভা কোনরকম ভাবান্তর দেখাল না। পূরবী শুধু কৌতূহল চাপতে না পেরে তপতীকে জিজ্ঞাসা করে, "যা শুনছি, সত্যি নাকি?"

ওর কথার মধ্যে অবিশ্বাসের সুরটি তপতীর ভাল লাগল।

ব্যাপারটা যে বাস্তবতার স্তর ছাড়িয়ে অবাক করার পর্যায়ে উঠে গেছে, এবং তার নায়িকা সে নিজে, এই অনুভবটুকু উপভোগ করার জন্য তপতী গম্ভীর হয়ে বলল, "দেখ না কি ঝামেলায় পড়লুম। অত বড় একটা বাড়ি, আমি যে কি করব ওটা নিয়ে। এক একটা ঘর আমাদের আড়াইখানার সমান, অমন চারটে ঘর দোতলাতেই। একবার কলি ফেরাতেই তো ওঁর দুমাসের মাইনে বেরিয়ে যাবে। আমাদের মত লোকেদের কি পোষায় অমন বাড়ি?"

"ওনার আর কেউ নেই?"

"কার, বিমানমামার? জ্ঞাতিরা আছে। অস্থাবর যা কিছু তাদেরই দিয়েছেন।"

"কিন্তু যদ্দুর শুনেছি, বিমান মৈত্র তো তোমার মামার বন্ধু, তাহলে আত্মীয়স্বজনদের বাদ দিয়ে তোমায় বাড়িটা দিলেন যে!"

পূরবীর এই কৌতূহলী প্রশ্ন পাড়ার সব বাড়িতেই, অন্য ভাষায় ও ভাবে কেউ না কেউ তুলল রুবির কাছে। রুবি ভেবেচিন্তে জবাব দেয়, মা তো ওনার মেয়ের মতই ছিল। ছোট থেকে উনিই তো মাকে মানুষ করেছেন। নিজে বিয়ে করেননি, তিন কুলেও কেউ নেই, বাড়িটা তাহলে আর কাকে দেবেন?

তাই বলে আস্ত একটা বাড়ি!

রুবি বলে, বনেদী বড়লোকরা দিতে হলে এমন জিনিসই দেয়।

শোনা যায়, লোকটা নাকি দুশ্চরিত্র ছিল?

রুবি বলে, এটা ওঁর শত্রুদের রটনা।

কিন্তু লোকটা নাকি ওর রক্ষিতাদের সবাইকেই বাড়ি করে দিয়েছে, এটা কি সত্যি?

রুবি থমথমে মুখে তপতীর কাছে এসে বলল, "সবাই কেমন খারাপ ইঙ্গিত করছে এই বাড়ি পাওয়া নিয়ে।"

শুনে তপতী রেগে উঠল, "যা খুশি বলুক, তোর দরকার কি কান দেওয়ার। এইসব বলেই তো ওরা বুকের জ্বালা জুড়োবে।"

কিন্তু মনের মধ্যে অস্বাচ্ছন্দ্যের মেঘ জমতে শুরু করল তপতীর। মামীমার মুখ দিয়ে প্রথম যখন এই ধরনের কথা হঠাৎ বেরিয়ে আসে, তখনই গুরগুর করে উঠেছিল ওর বুকের মধ্যে। এখন চারদিকে চমক দিচ্ছে এই কৌতূহলটা—কেন দিল, কেন দিল। ওর সঙ্গে কি এমন সম্পর্ক।

একদিন পূরবী কিছুটা উত্তেজিত হয়েই বলল, "চারদিকে কি সব শুনছি।"

"চারদিক আবার তুমি কোথায় পেলে। কারুর সঙ্গে তো কথা বলো না, তাহলে কানে এল কি করে?" তপতী ঝাঁঝালো গলা করল শোনামাত্র।

"আমি বলি না কিন্তু তোমার ছাওর তো বলে। পাড়াতেই শুনেছে। আমায় এসে বলল, শুনে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল।"

"কি শুনেছে ঠাকুরপো?" এবার তপতীর গলা কেঁপে উঠল।

"সবাই যা বলাবলি করছে তাই শুনেছে। অবশ্য এসব কথা ও একদম বিশ্বাস করেনি, শুধু বলেছে,—ওঠে কেন, লোকে বলার সাহস পায় কেন?"

প্রতুলের গলা নকল করেই পূরবী বলল এবং তপতীর কানে শাসন ও বিরক্তি মেশানো সুরটা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল। নিরুপায়ের মত সে বলল, "লোকের মুখ তো আমি বন্ধ করতে পারি না। বলে বলুক, কপালে যদি এইসব শোনা লেখা থাকেই কে খণ্ডাবে বলো?"

শুধু তোমার কপালেই তো নয়, আমাদের কপালেও শুনতে হবে। ওর অফিসের লোক, আমার বাপের বাড়ির লোকজন প্রায়ই তো আসে, যদি তাদের কানে যায়? তাহলে আমাদের মানমর্যাদা থাকে কোথায়?" পূরবীর মুখে ভয় অস্বস্তি এবং বিরক্তি পর পর প্রলেপ ফেলল, দেখে মুষড়ে পড়ল তপতী।

ডলি একটি কথা বলেনি বাড়ি পাওয়া সম্পর্কে, তবে তপতীর মনে

হয়েছে, ওর চাহনির মধ্যে এক ধরনের শাণিত তীব্রতা দেখা যাচ্ছে, যেটা চোখে পড়লেই বুকের মধ্যে যন্ত্রণা কেটে বসে। অবশ্য ডলি সঙ্গে সঙ্গেই চোখ সরিয়ে নেয় কিন্তু তপতী অনুভব করে ডলি কি যেন খুঁজছে, কিছু একটা ব্যাপার সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইছে। তপতীও বুঝতে চেষ্টা করে, ডলি কি খুঁজছে? মাঝে মাঝে ভয় হয়, ডলি হয়তো বলবে,—এইবার, এইবার কি বলবে? আমি তো খারাপ, আমি তো ব্যভিচারী, আর তুমি? লোকে কি বলছে, শুনেছ? তপতী আড়ষ্ট হয়ে যায়,—হো হো শব্দে ডলি হাসছে, কল্পনা করে।

কিন্তু এর থেকেও তপতীর বেশি ভয় নিখিলকে। আজকাল কথা প্রায় বলেই না। অফিস থেকে ফিরে আগে বাড়ির প্ল্যান আর ইঁট, বালি, কাঠ, লোহা ইত্যাদির হিসেব নিয়ে বসত। এখন আর বসে না। বাড়ি করার আশা ছেড়ে দিয়েছে। অফিস থেকে আর সোজা বাড়ি ফেরে না। তপতী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, নিখিল জবাব দেয়, অ্যাটর্নীর বাড়ি গেছলাম। পাড়ার কানাঘুষো ওর কানে ওঠার সুযোগ নেই। পাড়ার কারুর সঙ্গে নিখিল কথা বলে না, বাড়িতেও না। তবু তপতীর ভয় করে। এইসব কথা কানে গেলে ওর গাম্ভীর্যের কঠিন খোলস ভেঙে কি চেহারা বেরিয়ে আসবে! অতর্কিতে কেন জানি ওর চোখে ভেসে ওঠে ছোটবেলায় দেখা পূতনা রাক্ষসীকে। সন্ধ্যেবেলায় ঝমঝম ঘুঙুর বাজিয়ে গলি দিয়ে যেত। একদিন হঠাৎ জানলায় দাঁড়ানো তপতীর দিকে মুখ ফিরিয়ে লম্বা নকল হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল, আঙুলের নখগুলো রাংতামোড়া ছুঁচলো, মুখোশ থেকে বেরিয়ে এসেছে টকটকে জিভ। আট বছরের তপতী চীৎকার করতে পারেনি, শুধু থরথর করে ভয়ে কেঁপেছিল।

ভয় পাওয়ার এই কথাটা মনে পড়তেই তপতীর হাসি পায়। তারপর মনে হয়, নিখিলের মধ্যেও অনেক হাসির জিনিস আছে। ওর হতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আর হয়ে ওঠার ক্ষমতার মধ্যে ব্যবধানটা

এত বিরাট যে, ওর চেষ্টাগুলোকে ভড়ং ছাড়া আর কিছু মনে হয় না।

একদিন রাত্রে হঠাৎ প্রদীপ এল। বিমান মৈত্রের নিকটাত্মীয়, অর্থাৎ সম্পত্তির উপর দাবী জানাবার অধিকার আছে যাদের, নিখিল তাদের নাম সংগ্রহের জন্য প্রদীপকে বলেছিল, যেহেতু ওর মামাতো বোন ও ভগ্নিপতি বিমান মৈত্রের প্রতিবেশী।

পাশের ঘর থেকে রুবি এসে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল। প্রদীপ ওকে দেখেই আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে নিখিলের মুখের দিকে প্রাণপণে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখল।

"পেয়েছ নামগুলো?" নিখিল জানতে চাইল।

"একটা নাম পাওয়া গেছে। বিমান মৈত্রের কাকার ছেলে, কার্তিকচন্দ্র মৈত্র। এই লোকটাই এখন সব থেকে নিকটাত্মীয়, জামাইবাবুর সঙ্গে আলাপও আছে।"

নামটা শুনেই তপতী সিধে হয়ে বসল। ধবধবে ফর্সা, টিকোলো নাক, নির্লোম গাল, টুকটুকে পাতলা ঠোঁট আর কাটা কাটা স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলে—এমন একটা হ্রস্বাকৃতি লোকের চেহারা ওর চোখে ভেসে উঠল।

"আর কেউ নেই?" নিখিল খোঁজ করল।

"এই লোকটাই তো এখন বাড়িটা দখল করে তালা দিয়ে রেখেছে। আর কাউকে তো জামাইবাবু দেখতে পাচ্ছেন না। আর এসব প্রশ্ন তো সরাসরি করা যায় না।"

"না না, তা যেন না করেন।" এই বলে নিখিল রুবির দিকে তাকিয়ে বলল, "চা করতে বল্।"

তপতী সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে বলল, "তুই নিজেই করে আন, আর ঠাকুরঝিকে বল, খানকয়েক লুচি করে দিতে।" তারপর কি ভেবে আবার বলল, "আচ্ছা তোকে আর যেতে হবে না, আমিই যাচ্ছি।"

ঘর থেকে বেরোবার সময় তপতী দেখল, রুবি কিছুটা সন্ত্রস্ত। হয়তো ভাবছে, তাকে প্রদীপের সামনে থেকে সরিয়ে দেবার এমন অজুহাত পেয়েও মা কেন কাজে লাগাল না! কিন্তু ও বুঝবে কি

করে, বাড়িটির নিকটতম দাবীদারদের নাম সংগ্রহের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত প্রদীপকে চাঙা রাখাটাই এখন তপতীর কাছে বিশেষ জরুরী।

রান্নাঘরে রুটি তৈরী করছিল ডলি। তাকে সরিয়ে তপতী নিজেই ময়দা মেখে লুচি এবং পটল ভেজে, চায়ের জল বসিয়ে ডলিকে বলল, "চা-টা করে ওপরে দিয়ে এসো তো, ঠাকুরঝি।"

"আমার দ্বারা সম্ভব নয়।"

তপতী নিচু হয়ে লুচির প্লেটটা তুলছিল। থমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। "কেন, কি হল?"

"কিছুই হয়নি।" ডলি শান্ত স্বরে বললেও, উনুনের তাপ, ঘাম আর চাপা রাগে ওর মুখে বন্য রোম ফুটে উঠেছে।

"তবে! চা করে উপরে তো অনেকবারই দিয়ে এসেছ, এখন অসম্ভব কেন?" সতর্কতা সহকারে তপতী বলল এবং লক্ষ্য করল ডলির গলায় প্যাঁচানো একটা শিরা জোঁকের মত ফুলে উঠছে।

"সবাই জেনেছে, সবাই, সবাই জেনেছে তোমার কীর্তির কথা। তুমি যে কী, কত জঘন্য, একটা বাড়ি পাওয়ার জন্য কোথায় যে নামতে পার—ছি ছি।"

"এসব তুমি কি বলছ!"

"আর ন্যাকামো করতে হবে না। তোমার মত মেয়েমানুষের হুকুম তামিল করতে আজ আমার ঘেন্না হচ্ছে।" ফণা তোলার মত ডলি উঠে দাঁড়াল। রাগে মুহ্যমান হয়ে তপতী কথা বলতে পারছে না, শুধু দুই চোখ তার ক্রোধের উত্তাপে বিস্ফারিত হল।

"আমিই শুধু কিছু পেলাম না। আমি বোকা, হদ্দ বোকা একটা, তাই আজ দাসীবৃত্তি করছি।" ডলির কণ্ঠ ও দেহ একই সঙ্গে থরথর করছে, "কিন্তু তুমি পার পাবে ভেবেছ? ধর্মের কল বাতাসে নড়বেই। তুমিও রেহাই পাবে না। ভাবছ, এখুনি আমাকে তাড়িয়ে দেবে ঘাড় ধরে লাথি মেরে। আমি জানি এখনো বড়দার কানে এসব পৌঁছয়নি। আমিই পৌঁছে দেব। আমিই বলব, সব

সত্যি, যা রটছে সব সত্যি। আমি নিজে চোখে দেখেছি তোমার ওই বিমানমামার সঙ্গে তুমি—” বলতে বলতে মুখখানা বীভৎস করে, নিঃশব্দে ডলি হাসতে শুরু করল। তপতী চীৎকার করে বলতে যাচ্ছিল, খুন করব। তার বদলে লুচির প্লেট হাতে দ্রুত রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল।

জানলার দিকে মুখ করে নিখিল পাঞ্জাবিতে মাথা গলাচ্ছে, রুবি প্রদীপের প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়ান, হালকা ধরনের একটা যন্ত্রণা চাপার প্রয়াসে দাঁতে দাঁত চেপে মুখটা বিকৃত করেই সে প্রদীপের কান টেনে ধরল, প্রদীপের বাঁ হাত রুবির হাঁটুর পিছনে এবং আড়চোখে নিখিলের দিকে তাকিয়ে—সেই সময়ই তপতী সিঁড়ির মাথায় পৌঁছল। রুবি ছিটকে সরে গেল, প্রদীপ বাঁ হাতটা তাড়াতাড়ি কোলের উপর রেখে সামলে ওঠার জন্য একটা কিছু প্রসঙ্গের অবতারণার প্রয়োজন বোধ করল।

গম্ভীর মুখে তপতী টুলটা টেনে এনে প্লেটটা নামিয়ে রেখে বলল, “খাও।” রুবি পাংশু মুখে কুঁজো থেকে জল গড়াতে বসল। প্রদীপ হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বলল, “জানেন কাকাবাবু, আজ সকালেই বাড়িতে একজন এসেছিল টিউশনি নিয়ে। ক্লাস টেনের মেয়ে, রোজ পড়াতে হবে, পঞ্চাশ টাকা। তবে একটা মুশকিল, যে জন্য আপনার কথাটা আর বলতে পারলাম না।”

নিখিল বোতাম লাগাতে লাগাতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। তপতী শুষ্ক স্বরে বলল, “কে টিউশনি করবে?”

“এখন তো টাকার দরকার,” নিখিল বলল, যেন কৈফিয়ৎ দিচ্ছে। “আয় না বাড়ালে কি চালাতে পারব এই বাড়তি খরচটা! সন্ধ্যেটা তো এমনিই বসে বসে কাটে, তাই প্রদীপকে বলে রেখেছিলুম।”

“মুশকিলটা তবে কিসের?” রুবি একটু বেশি রকমের আগ্রহ প্রকাশ করল, নিজেকে সহজ করার চেষ্টায়।

“ওরা গ্র্যাজুয়েটের কম মাস্টার রাখবে না, তাই কাকাবাবুর জন্য আর বলতে পারলুম না।”

"কেন, বাবা তো গ্র্যাজুয়েট।" বলেই রুবি ফিরে তাকাল নিখিলের দিকে।

"থাকগে এসব কথা।" রুক্ষ স্বরে, নিখিল একটু যেন বেশি চেঁচিয়ে বলল। "লোকটার নাম-ঠিকানাটা বলো তো লিখে নিই। এখনি অ্যাটরনিকে দিয়ে আসব, রুবি কলমটা দে।"

মুখ নিচু করে লুচিগুলো দ্রুত শেষ করতে করতে প্রদীপের মনে পড়ল, রুবি একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিল—'বাবার সঙ্গেই তো বি এ পাশ করেছিল জ্যোতিষ গুহ, এখন দিল্লিতে মন্ত্রী হয়েছে। কলেজ রি-ইউনিয়নে এসে বাবাকে দেখা মাত্রই চিনতে পেরে, অনেকক্ষণ গল্প করেছিল।' শুনে অবাক হয়েছিল প্রদীপ। কেননা, অফিসে তার কাজ রেকর্ড সেকশানে এবং নিখিলের সার্ভিস বুকে দেখেছে ম্যাট্রিকুলেট। কোথাও কোন গোলমাল আছে মনে করে সে তখন রুবির ভুলটা ভাঙেনি। কিন্তু এখন রুবির চোখের বিভ্রান্তি এবং নিখিলের স্বরের রুক্ষতা তাকে যেন বলে দিচ্ছে, সে ভুল করেছে। অনুচিত কাজ করেছে। ধূলি-ধূসর একটা সত্যকে ঝেড়ে মুছে উজ্জ্বল করার সঙ্গে সঙ্গে যেন সে নিষ্প্রভ করে দিল একটা ব্যক্তিত্বকে। নিখিলের প্রতি রুবির শ্রদ্ধার বিরাট একটা অংশ সে চুরমার করে দিল। প্রদীপের ভেতরটা কুঁকড়ে গেল এইসব ভেবে।

ওর খাওয়া শেষ হওয়া মাত্র নিখিল বলল, "বেরোবে তো?"

প্রশ্নের ভঙ্গিতে নির্দেশই ধরা পড়ল প্রদীপের কানে। "হ্যাঁ, আমার একটু তাড়া আছে," ব্যস্ত হয়ে সে বলল।

"চা খাবেন না?" রুবি বলল। তপতী একইভাবে বসে, একটি কথাও বলেনি। প্রদীপও কোন জবাব না দিয়ে, ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল। ওর পিছনে নিখিল। রুবি আশা করেছিল প্রদীপ একবার অন্তত তাকাবে।

সদর দরজা বন্ধ করার শব্দ হতেই রুবি বলল, "চা দিলে না যে?"

"চা নেই, ফুরিয়ে গেছে।" তপতী অন্যমনস্কভাবে বলল।

পাশের ঘরে যেতে গিয়ে থেমে, রুবি দেয়ালের দিকে তাকিয়ে

বিষণ্ণ গলায় আপন মনেই বলল, "তুমিই আমায় বলেছিল বাবা বি এ পাশ। বন্ধুদের আমি তাই বলেছি।"

তপতী জবাব দিল না। রাত্রে নিখিল এক সময় জিজ্ঞাসা করল, "রুবি তোমায় কিছু বলেছে?"

তপতীর উত্তর না পেয়ে, নিখিল কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার বলল, "প্রদীপকে বারণ করে দিলুম এ বাড়িতে আসতে। ছেলেটা বড্ড কথা বলে।"

কে যেন গান গাইছে চাপা গলায়। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তপতীর। কান পেতে বুঝল, নীচের ঘরে ডলি গাইছে, অনেক বছর পর। শুনতে শুনতে অবশ হয়ে পড়তে শুরু করল তপতীর স্নায়ু কেন্দ্র। ঘুমিয়ে পড়ার আগে নিজেকে আলতো স্বরে সে বলল, "একটা কিছু সর্বনাশ আসছে, আমার মন বলছে, আসছে।'

॥ সাত ॥

সবে তন্দ্রা লেগেছে চোখে, সদরে খুটখুট কড়া নাড়ার শব্দে তপতী চোখ মেলল। পাশের ঘরে রুবি গল্পের বই পড়ছে বা ঘুমোচ্ছে। নীচে ডলি বা প্রতিভা, কেউ একজন, নিশ্চয় দরজা খুলবে। কিন্তু এই ভরদুপুরে কে এল? তপতী সজাগ হয়ে রইল জানার জন্য।

আবার শব্দ হল কড়ানাড়ার। সাবধানে হিসেব করে করে কুণ্ঠিত ভাবে যেন কড়া নাড়ছে। সদরের খিল খোলার আওয়াজ হল। একটু পর ডলি চেঁচিয়ে ডাকল "রুবি, রুবি।"

তপতী ধড়ফড়িয়ে উঠে দালানে এসে উঁকি দিল। ডলি উঠোনে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে তপতীকে দেখে বলল, "তোমায় একজন খুঁজছেন। এই বলেই সে ঘরে ঢুকে গেল। রুবি তার ঘরে ঘুমোচ্ছে, একটা পাতা খোলা বই বিছানায় উপুড় করা। তপতী দোতলা থেকেই দেখতে চেষ্টা করল, কে তাকে খুঁজছে। সদর দরজা ভেজানো, দেখা

গেল না। নেমে এসে দরজা খুলেই সে থ হয়ে তাকিয়ে রইল। এই অকল্পনীয় উপস্থিতি সে আশা করেনি। কি জন্য এল, আমাকে ওর কি প্রয়োজন!

"দুপুরের দিকে আসাই ভাল মনে করলাম," পাতলা টুকটুকে ঠোঁট দুটি বিভক্ত করে বিনীত হাসিতে মাথা হেলাল কার্তিক মৈত্র।" "যাতে কথা বলতে সুবিধে হয়। অবশ্য এজন্য অফিস কামাই করতে হল।"

"কি কথা?" বিস্ময়ের ঘোর তপতীর কাটেনি। বুকের মধ্যে ঢিবঢিবানি শুরু হয়ে গেছে। আরো বিনীত এবং মিহি স্বরে কার্তিক বলল, "এখানে দাঁড়িয়ে বলায় একটু অসুবিধে আছে, যদি ভেতরে কোথাও বসে বলা যায়—"

তপতী ভাবল, কোথায় বসান যায়। বৈঠকখানা নেই, কেউ এলে শোবার ঘরেই বসান হয়। কিন্তু তারা পরিচিত, এই লোকটি একেবারেই অজানা। তবে বিমান মৈত্রের সম্পত্তির নিকটতম দাবীদার যখন, নিশ্চয় বাড়িটি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলতেই এসেছে—এই অনুমান করে সে বলল, "আপনি সন্ধ্যের পর আসুন না, তখন উনি থাকবেন।"

"আমি আপনার সঙ্গেই কথা বলতে এসেছি। আপনি যা ভেবেছেন তাই নিয়েই। হাইকোর্ট থেকে নোটিশ পেয়েছি।"

"এ সব ব্যাপারে যা করার আমার স্বামীই করছেন, আমি তো কিছুই জানি না, শুধু যেখানে সই করতে বলেছেন করেছি, কাজেই—"

হাত তুলে কার্তিককে স্মিত হাস্য করতে দেখে তপতী থেমে গেল। "জানি," কার্তিক হাসিটা মুখ থেকে তুলে নিয়ে বলল, "মহিলাদের দ্বারা তো কোর্ট-ঘর করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমার কথা বলা দরকার আপনার সঙ্গেই, কেননা বিমানদা নাকি বাড়িটা আপনাকেই দিয়ে গেছেন। এ সম্পর্কে আমার দু-একটা কথা বলার আছে আপনাকেই।"

তপতী লক্ষ্য করল, শেষ দিকে কার্তিকের স্বরে কাঠিন্য এসে

পড়ছিল। ও যেন বদ্ধপরিকর তার সঙ্গে কথা বলবেই। তপতীরও কৌতূহল শুরু হল, কি বলতে চায় লোকটা! কার্তিককে নিয়ে সে উপরে এল। ওঠার সময় সিঁড়ির জানলা দিয়ে দেখল, ডলি দরজার কাছে বসে কি একটা সেলাই করছে।

রুবির ঘুম ভাঙ্গিয়ে তপতী বলল, "ওঘরে গিয়ে ঘুমো, আমি ওনার সঙ্গে কথা বলব।" রুবি একবার কার্তিকের দিকে তাকিয়ে ঘুম-জড়ানো চোখে বেরিয়ে গেল। কার্তিক চেয়ারে বসে রুবির পাঠ্য বইগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে বলল, "আমার বড় মেয়ে এবার হায়ার সেকেণ্ডারি দেবে, হিউম্যানিটিজ নিয়ে পড়ছে।"

"তাই নাকি। কয় মেয়ে আপনার?" সাধারণভাবে আলাপ শুরুর একটা সূত্র হিসাবে তপতী প্রশ্নটি ব্যবহার করল এবং মনে মনে নিজেকে গুছিয়ে নিল। মেয়ের কথা বলার জন্য লোকটা নিশ্চয় আসেনি।

"আমার তিন মেয়ে। ছেলে নেই, হবেও না," কার্তিক বিষণ্ন স্বরে বলল। "স্ত্রীর স্বাস্থ্য খুবই খারাপ, ধকল সামলাতে পারবে না। আমার ভাগে বাড়ির যে অংশটুকু, তা মেয়েরাই পাবে। মাঝে মাঝে যখন ভাবি, মেয়েদের তো বিয়ে হবে, মৈত্র বংশের বাইরের লোক হয়ে যাবে, তখন মাথাটা কেমন গরম হয়ে ওঠে। মৈত্রদের শরিক হয়ে সম্পত্তি ভোগ করবে বাইরের লোক? আবার ভাবি, জামাইরা তো বারেন্দ্রই হবে, সম্পত্তি তো নিজের জাতের মধ্যেই থাকবে!"

তপতী এইবার যেন খানিকটা আভাস পাচ্ছে, লোকটা কি বলতে চায়। বিমান মৈত্রের, অন্য জাতের একজনকে বাড়িটি দিয়ে যাওয়া কার্তিক মৈত্র অনুমোদন করেনি।

"তাই আমি চাই না আপনি আমাদের শরিক হোন। এ বাড়ি ন্যায্যত আমাদেরই পাওয়ার কথা। বংশের বাইরের কাউকে, বিশেষতঃ একজন স্ত্রীলোককে, একটা বাড়ি দেওয়ার মধ্যে কোনই যুক্তি নেই, তাই ব্যাপারটা খটকা লাগে।" কার্তিক মাথা নামিয়ে তর্জনী দিয়ে টেবিলে কাটাকুটি করতে করতে বলে যাচ্ছিল। এইবার

ঝাঁকুনি দিয়ে মাথা তুলে কর্কশ স্বরে বলল, "বিমান মৈত্রের এই কাজ অবিশ্বাস্য, যুক্তিহীন। আমাদের ধারণা এই কামুক ও উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের বৃদ্ধের সঙ্গে আপনার অবৈধ সম্পর্ক ছিল। কোন এক দুর্বল মুহূর্তে, তাকে দিয়ে বাড়িটি লিখিয়ে নিয়েছেন।"

কার্তিক মুহূর্তের জন্যও চোখ সরায়নি, তর্জনী দিয়ে কাটাকুটি আঁকা অব্যাহত রয়েছে, বরং এখন একটু দ্রুত। তপতীর চোখের সামনে কার্তিক ক্রমশ বাষ্পে পরিণত হতে হতে কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেল। তার নিজের দেহের মধ্যে এইমাত্র একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেছে যার ফলে অস্থি থেকে মাংস বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, স্নায়ুসমূহ জট পাকিয়ে যাচ্ছে এবং মস্তিষ্ক তরল হয়ে নাক কান ও চোখ বেরিয়ে আসছে।

"এই মর্মেই আমার জবাব দিয়েছি, প্রোবেট নেওয়ার বিরুদ্ধে মামলাও লড়ব এই গ্রাউণ্ডে। আপনার অ্যাটর্নির কাছে নিশ্চয় আমার আপত্তি পৌঁছে গেছে, নয়তো দু'এক দিনের মধ্যেই পৌঁছবে। আমার আসার উদ্দেশ্য হল—" কার্তিক হাতের চেটো দিয়ে টেবিলের অদৃশ্য কাটাকুটিগুলো মুছে, অকম্প ও স্পষ্ট উচ্চারণে বলল, "বাড়িটার ওপর আপনার দাবী ছাড়তে হবে। তা না হলে মামলা লড়তে হবে আপনাকে। সেটা সময় এবং অর্থ সাপেক্ষও বটে।" থেমে গিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে আচম্বিতে চেঁচিয়ে উঠল সে, "শোন, শোন তো মা।"

রুবি নীচে যাচ্ছিল, কার্তিকের ডাক শুনে দাঁড়াল।

"একটু জল খাওয়াতে পারবে, ঠাণ্ডা জল।"

রুবি ঘাড় নেড়ে চলে যেতেই কার্তিক বলল, "আমি মামলা লড়তে রাজী আছি। দশ-বিশ যত হাজার টাকাই লাগুক খরচ করব। কিন্তু আপনারা কি তা পারবেন! যতদূর খোঁজ পেয়েছি তাতে মনে হয় না নিখিলবাবুর সে সাধ্য আছে।" রুবিকে জলের গ্লাস হাতে ঢুকতে দেখে থেমে গেল।

জল খেয়ে গ্লাসটা ফিরিয়ে দেবার সময় রুবির দিকে তাকিয়ে মিষ্টি

হেসে কার্তিক বলল, "তোমার ক্লাসের একটি মেয়ে আমার সম্পর্কে শালী হয়, ললিতা বাগচি, চেনো ?"

রুবি ভ্রূকুঞ্চিত করেই ঘাড় নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কার্তিক জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে, কিছু একটা ভাবতে লাগল, জানলার বাইরে তাকিয়ে। তপতী জমাট বেঁধে বসে আছে অনেকক্ষণ, একটা কথাও বলেনি।

"একটা দামী বাড়ি আপনিও ছাড়বেন না, আমিও ছাড়ব না! ফলে মামলা চলবে, টাকার শ্রাদ্ধ হবে।" কার্তিক দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

"আমার সঙ্গে ওঁর অবৈধ সম্পর্ক ছিল, আপনি ঠিক তা জানেন ?" তপতী এইবার কথা বলল। ওর ভিতরে কি ঘটছে সেটা কণ্ঠস্বরের কম্পনে কার্তিক বুঝে নিয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলল, "না না, আমি জানব কি করে। ব্যাপারটা খুবই জঘন্য। একজন মহিলা সম্পর্কে এইসব কথা বলা খুবই অন্যায়, যদি সত্যিও হয় তবু বলা উচিত নয়। কিন্তু—" কার্তিক ব্যথিত চোখে তাকাল তপতীর দিকে।

"তুচ্ছ একটা বাড়ির জন্য, এত বড় একটা কলঙ্ক আরোপ করতে আপনার ধর্মে আটকাবে না ? আমার কী অপরাধ ?"

"বাড়িটা তুচ্ছ হতে পারে কিন্তু আমাদের বংশ, তার মর্যাদাটা তুচ্ছ নয়। অন্য জাতকে আমরা শরিক হতে দিতে পারি না। অন্যায় করেছেন মৈত্র বংশেরই একজন, তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে আমি রাজী আছি। তাতে যদি অধর্ম হয় হোক, যদি পাপী হতে হয় হবো, যে কোন উপায়ে আমি এই বাড়ি বাইরের লোকের হাতে পড়তে দেব না।"

"আপনাদের অন্য শরিকরা তো তাদের অংশ বাইরের লোককে বিক্রি করেছেন ?"

"সেটা বন্ধ করার কোন উপায় আমার ছিল না, থাকলে নিশ্চয় আটকাতাম। কার্তিকের মুখ অক্ষম রাগে থমথম করে উঠল। "কিন্তু এটা বিক্রি নয়। বিমান মৈত্রের স্বেচ্ছাকৃত দানে আপনি পাচ্ছেন, দুটোর মধ্যে যে তফাৎ সেটা আপনি বুঝবেন না, কোনদিনই

বুঝবেন না।" উত্তেজিত হয়ে কার্তিক টেবিলে ঘুষি বসাল। তপতীর মুখ লাল হয়ে উঠছে। তুজনে তুজনের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

"আমি অনেক কিছুই বুঝি কিন্তু বংশমর্যাদার এই ভড়ংটা বুঝি না। ওটা অক্ষম অযোগ্যদের একটা ছেলেমানুষী বীরত্ব দেখাবার উপায় মাত্র, তাই দেখিয়ে লজ্জা নিবারণ করা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই বংশমর্যাদা আপনার মত লোকেদের একটা নেংটিমাত্র।"

"আস্তে, আস্তে, আপনার মেয়ে পাশের ঘরেই আছে," গলা নামিয়ে কার্তিক বলল। মুখে মৃতু হাসি ফুটে উঠেছে, যেন তপতীর কথাগুলো খুবই উপভোগ্য। "আপনার সঙ্গে এই নিয়ে তর্ক করতে আসিনি। আমি এসেছি আপনাকে বা আপনার এই সংসারকে সর্বনাশ থেকে বাঁচবার পরামর্শ দিতে। মামলা কি জিনিস বংশানুক্রমে আমরা তা দেখে এসেছি। মৈত্র বংশের আজকের এই তুর্দশার মূলেই রয়েছে মামলা। এটাকে যত এড়িয়ে চলা যায়, ততই মঙ্গল, তাতে তু তরফেরই লাভ। হাত জোড় করে বলছি, আপনি প্রোবেটের দরখাস্ত তুলে নিন।"

"না। মিথ্যা ভয় দেখিয়ে আপনি কাজ হাসিল করতে পারবেন না।" তপতী দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে উঠল। উত্তেজনা চাপার জন্য একবার এধার ওধার তাকিয়ে, ঘর থেকে বেরিয়ে দালানে এসে দাঁড়াল। একা ঘরে মাথা নামিয়ে কার্তিক আবার কাটাকুটি শুরু করল টেবিলের উপর। একটু পরেই তপতী ঢুকল। "আপনার যা বলার শুনেছি, আমার কথাও শুনেছেন, এবার আপনি আসতে পারেন।"

কার্তিক কিছুক্ষণ তপতীর মুখে দিকে তাকিয়ে থেকে উঠে দাঁড়াল। "তাহলে আপনি তৈরী হোন। মামলা যাতে গড়াতে না পারে, আপনি নিজে থেকেই যাতে দরখাস্ত তুলে নেবার জন্য কোর্টে ছুটে যান, আগে সেই ব্যবস্থাই করব।" ধীর শান্ত কণ্ঠে কথাগুলো বলে, বিষণ্ন চোখে তপতীর দিকে আবার তাকিয়ে কার্তিক বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নামল। রাস্তায় বেরিয়ে সন্তর্পণে

সদর দরজাটি ভেজিয়ে দিল।

ওঘর থেকে রুবি এসে দেখল, তপতী খাটে শুয়ে, দু হাত আড়াআড়ি চোখের উপর রাখা।

"লোকটা কে, মা?"

তপতী জবাব দিল না। রুবি আবার বলল, "ললিতাটা ওর শালী! ভীষণ বাজে মেয়ে, সবার নামে নিন্দে রটিয়ে বেড়ানই পেশা। আমার সঙ্গে একদিন লেগেছিল। আচ্ছা করে দিয়েছি শুনিয়ে।"

তপতীর কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে রুবি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তপতী বিকেল পর্যন্ত একভাবে শুয়ে শুধু ভেবেই গেল কার্তিকের কথাগুলো। কখনো সে ভয় পেল, কখনো রাগে বিড়বিড় করল। ফাঁদে আটকা-পড়া জন্তুর মত মনের মধ্যে অবিরত ঘুরপাক খাচ্ছে একটি কথা—এ কি হল! কুড়ি বছর ধরে তিলতিল কাজের দ্বারা অন্যের মনে যে ধারণা গড়ে তুললাম তা খানখান হয়ে যাবে একটা বাড়ি পাওয়াকে কেন্দ্র করে? মানুষের জীবন তো এই ধারণাগুলো যোগ করে করেই বেড়ে ওঠে। যদি ধারণা বদলায় তাহলে তো জীবনও বদলাবে? ধারণা ভেঙে পড়লে কি জীবনেরও পতন ঘটবে? অন্যের চোখে নিজের প্রতিফলন দেখে বোঝা যায়, আমি কে, কোথায় আমার স্থান। চোখগুলোই ধারণা, আয়নার মত। সেই আয়নায় ঢিল ছুঁড়বে কার্তিক মৈত্র। ধারণাগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে। তখন আমার পতন হবে।

মরীয়া হয়ে, একটা কিছুর আড়ালে গিয়ে নিজেকে বাঁচাবার কথা ভাবতে ভাবতে তপতীর মনে, একদা সূর্যাস্তের প্রাক্কালে দেখা নিজের জমির উপর দাঁড়ান নিখিলের রোমহর্ষক মূর্তিটি নিরন্তর উদ্ভাসিত হল। সেই মূর্তিটিকে কুড়ি বছরের আলোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে তপতী বুঝে উঠতে পারল না এটা পুতুল কিনা। তার সন্দেহ হল, এটা ভেঙে যেতে পারে হয়তো। নিখিলের ভিতরে অনেক ফাটল আছে। কিন্তু নিখিল ছাড়া আর কার উপরই বা সে ভরসা করবে!

রাত্রে সে নিখিলকে বলল, "বাড়িটার জন্য শুধু তো টাকা খরচই নয়, দৌড়োদৌড়ি করা, উদ্বেগের মধ্যে থাকা, তার উপর আপত্তি জানিয়ে যদি কেউ মামলা করে বসে তো আর কথাই নেই। তার থেকে যেমন ছিলাম তেমনি থাকাই ভাল, দরকার নেই বাড়িতে।"

"সম্পত্তি পেতে হলে টাকা খরচ কি দৌড়ঝাঁপ তো করতেই হবে।" নিখিল খবরের কাগজ পড়তে পড়তে স্বাভাবিক স্বরেই বলল।

"সেই করাটা বরং নিজের হাতে গড়া বাড়ির জন্য দিলে, অনেক তৃপ্তি অনেক সুখ পাওয়া যাবে।"

"তা যাবে, কিন্তু এত দামী বাড়ি তা দিয়ে হবে না।"

"না হোক, এ বাড়ি না নেওয়াই ভাল। আমার ইচ্ছে করছে না এমনভাবে বাড়ি পেতে। তুমি বরং আর এগিয়ো না।"

অনেকগুলো টাকা ইতিমধ্যেই খরচ হয়ে গেছে, এখন এইসব কথা বলার কোন মানে হয়! তাহলে আগে বলনি কেন?" বিরক্ত স্বরে নিখিল বলল। তপতী বুঝল আর কথা বলে কোন ফল ফলবে না। ফিরে যাবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। কার্তিক মৈত্রের জবাব এখনো পায়নি নিখিল। যেদিন পাবে, ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে অপেক্ষা করা ছাড়া তারপর তপতীর আর কিছুই করার থাকবে না।

॥ আট ॥

দিন দশ পরের এক সকালে, নিখিল অফিসে বেরিয়ে যাবার পর, তপতী ছাদে উঠে কাচা কাপড়গুলো মেলে দিয়ে পাঁচিলের ধারে দাঁড়াল। গলিটা সোজা গিয়ে পড়েছে বড় রাস্তায়। ছাদ থেকে বাঁদিকে তাকালে সেই মোড়টা দেখা যায়। ডানদিকে, গলিটা বেঁকে ঘুরে গেছে একখানা বাড়ির পরই। তপতী নিরুৎসুকভাবেই বড় রাস্তার দিকে তাকাল। এখুনি রুবি কলেজ থেকে ফিরবে, ওই পথ

দিয়েই। তপতী মাঝে মাঝে ইএ সময় ছাদে এসে লক্ষ্য করে রুবির বাড়ি ফেরা। প্রায়ই ওর সঙ্গে চার-পাঁচজন সহপাঠিনী থাকে, তারা সিধে চলে যায়, রুবি গলিতে ঢোকে। গলির মুখেই দু' ধারে রক। কিছু ছেলে এই সময় বসে থাকে। ওরা পাড়ারই, অধিকাংশই স্কুল বা কলেজের ছাত্র। তপতী অনেককেই নামে চেনে। ওদের কেউ রাত্রে কলেজে পড়ে, কেউ বা পড়া বন্ধ করে চাকরি খোঁজায় ব্যস্ত। ওরা খবরের কাগজ পড়ে আর তর্ক করে, মেয়েরা গলি দিয়ে যাবার সময় বাচ্চারা রাস্তায় বল খেললে, খেলা থামিয়ে দেয়, নবাগতরা বাড়ির নম্বর খুঁজে না পেলে, ওরা বাড়ি দেখিয়ে দেয়। হরতালে বড় রাস্তায় বল খেলে, সার্বজনীন পুজোর চাঁদা তোলে, কাছাকাছি গুলি বা বোমার শব্দ হলে গলি থেকে বেরোয় না।

সকাল দশটা-সাড়ে দশটা নাগাদ সময়টায় গলিতে সবাই ব্যস্ত। তপতী দেখল রকে দুটি মাত্র ছেলে, যাই-যাই করছে। দোতলার এক বারান্দায় ক্লান্ত ভঙ্গিতে একটি বৌ রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। একটা বাড়ি থেকে আলুওয়ালার চেনা গলা ভেসে এল, বাকি দামের তাগাদা দিচ্ছে। একটা রিক্সা ঢুকল গলিতে, তাতে এক বৃদ্ধা ও এক কিশোরী। ওদের দেখতে দেখতে রিক্সার সঙ্গে দৃষ্টিকে অনুসরণ করিয়ে তপতী ডানদিকে মুখ ফিরিয়েই, তিনটি ছেলেকে মোড় ঘুরতে দেখল। তার মনে হল মাঝের ছেলেটি বাবলু। রিক্সার আরোহিণীদের দিকেই ওরা তাকিয়ে। রিক্সাটা পাশ দিয়ে চলে যেতেই তিনজনের একজন অযথা চেঁচিয়ে বলল, "মধু গুলগুলি বে, ভাল আমসত্ব হবে।"

"দুঃশালা, আম চিনিস না। কাঁচামিঠেকে বলছিস মধুগুলগুলি। এসব হচ্ছে সরষেবাটা-কাঁচালঙ্কা দিয়ে খাবার আম।"

এই বলেই বাবলু উপর দিকে তাকাল। পাঁচিল থেকে তপতীর মুখটুকু দেখা যাচ্ছে মাত্র। কয়েক লহমার মধ্যেই ও চিনতে পেরে সঙ্গী দুজনের দিকে তাকিয়ে চোখ মেরে বলল, "ওটা কি আম বলতো বে?"

দু'জোড়া চোখ তপতীর মুখে আছড়ে পড়ল। পাড়ার এক বৃদ্ধ

তখন ওদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে থমকে ফিরে তাকাল ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে। তিনজন গ্রাহ্য করল না। তপতীর মুখে যেন এক জ্বলন্ত কয়লা ছুঁড়ে মারা হয়েছে। অসহনীয় জ্বালায় ছটফট করে সে পাঁচিলের ধার থেকে সরে এসে ছু' হাতে মুখ ঢেকে রাগে কাঁপতে শুরু করল।

"অ্যাই, কি হচ্ছে তোমাদের, এটা ভদ্রপাড়া সে খেয়াল নেই?" বৃদ্ধের গলা শোনা গেল।

"আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছি দাদু, আপনি কান দিচ্ছেন কেন তাতে?"

"এইরকম অসভ্য কথাবার্তা! তোমাদের মায়ের বয়সী না উনি?"

"নিশ্চয় নিশ্চয়, মায়ের বয়সী তো বটেই। দাদু আমাদের অন্যায় হয়ে গেছে, মাপ চাইছি। অ্যাই পল্টু হাত জোড় করে দাদুকে বল্, দাদু এটা ভদ্রপাড়া জানতুম না।"

বৃদ্ধ আবার কিছু একটা বলল।

"আর ঝামেলা বাড়াচ্ছেন কেন দাদু, যেখানে যাচ্ছিলেন সেখানে যান।" বিরক্ত হয়ে একজন বলল, তারপর ওরা চেঁচিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে চলে গেল। দোতলায় নেমে এসে তপতী শুনতে পেল, পাশের বাড়ির ঝি বারান্দা থেকে বলছে, "ওই রুবির মাকে কি যেন বলেছে ছোঁড়াগুলো তাই নিয়েই—" সামনের বাড়ির একতলা থেকে একজন বলল, "ক'দিন ধরেই দেখছি ওই তিনটে ছেলে, যাচ্ছেতাই সব কথা বলতে বলতে আসা-যাওয়া করছে।"

খাটে বসে স্তম্ভিত হয়ে তপতী ভাবল, কার্তিক মৈত্র সেদিন তৈরী হতে বলে গেছল। তাহলে এইভাবেই এবার সে কাজ শুরু করে দিয়েছে। অপমানে আর লজ্জায় উত্যক্ত করার জন্য বাবলু আর তার বন্ধুদের লাগিয়েছে। এইভাবে ওরা বাধ্য করবে নতিস্বীকারে। দিনের পর দিন নোংরা ভাবভঙ্গি আর অশ্লীল কথা দিয়ে লোক জমাবে, ভয়ে কেউ ওদের বিরুদ্ধে যাবে না, বরং মজাই পাবে তারা, লোকেরাও

ক্রমে ওদের সঙ্গে যোগ দেবে। তারপর এক সময় নিখিলের কানেও উঠবে, যে নিখিল মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে—চরিত্র যার নেই সে কেঁচো এবং মানমর্যাদা রক্ষা করার জন্য যে মানুষ খুন করতেও পিছপা হবে না।

এর পর থেকে নিখিল অফিসে বেরিয়ে গেলেই তপতী রাস্তার দিকে ঘরের জানলাগুলো বন্ধ করে রাখে। রাস্তায় উচ্চস্বরে কেউ কথা বললেই বন্ধ জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়। বাবলুর গলার স্বর বুঝতে পারলেই অবশ হয়ে যায় দেহ। একদিন কলেজ থেকে ফিরেই রুবি কান্নায় প্রায় ভেঙে পড়ল।

"তিনটি ছেলে রোজ পাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে শুনিয়ে শুনিয়ে যা-তা কথা বলে। আজ কি বলেছে জান?"

রুবি পাছে বলে ফেলে, তাই ওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তপতী বলল, "দরকার কি তোর কান দেবার, যা খুশি বলে বলুক।"

"আমার সঙ্গে যে ক্লাসের মেয়েরা থাকে, তারা তো শুনতে পায়। আজ আলো-মালাই তো বলল, বিচ্ছিরি এই সব কথা তোকে বলে কেন রে? বাড়ির কাউকে বলে এদের ঠাণ্ডা করে দিতে পারিস না! দাঁড়াও না, আজ বাবাকে বলব।"

"না, না, খবরদার ওকে বলিস নি," তপতী ব্যস্ত হয়ে বলল, "মাথা গরম মানুষ, এই সব শুনলে হয়তো এমন রেগে উঠবে যে রগের শির-টির ছিঁড়ে মারাও যেতে পারে।"

কথাগুলো বলে তপতী লক্ষ্য করল, রুবির মুখে নিখিলের নিরাপত্তার প্রতি আনুগত্যের লক্ষণগুলি ফুটে উঠেছে। আশ্বস্ত হল সে।

"তোমাকে উদ্দেশ্য করেই তো ওরা যত নোংরা কথা বলে।"

বিরক্ত স্বরে কথাগুলো বলে রুবি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তপতীর ইচ্ছে হল বলতে, আমার কি অপরাধ! আমি তো বিমান-মামার কাছে বাড়ি চাইনি। তিনি দিলেন কেন তাও জানি না।

আমি জানি না, ভাগ্য কেন আমায় নিয়ে এমন নিষ্ঠুর খেলা শুরু করেছে। আজ আমি ওকে বলব, উইলটা কুচিকুচি করে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসে যেন। ওই বাড়িতে আমার দরকার নেই।

সন্ধ্যা থেকে তপতী অপেক্ষায় রইল নিখিলের। ফিরতে দেরী হচ্ছে। নানাবিধ অনুমান করতে করতে তার মনে হল, বোধ হয় অ্যাটর্নীর বাড়ি গেছে। কার্তিক মৈত্রের জবাব নিশ্চয় এতক্ষণে জেনে গেছে। জেনেছে, তার স্ত্রী এক লম্পট স্বভাবের বৃদ্ধের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত ছিল। বৃদ্ধকে দিয়ে বাড়িটি নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছে। এই উইল বিকারগ্রস্ত বা মোহগ্রস্ত বা বিভ্রান্ত চিত্তের রচনা। একে যথার্থ বলে স্বীকার করা যায় না। এই জবাব জেনে লজ্জায় অপমানে রাগে থমথমে একটা মুখ, কিছুক্ষণ ধরে কল্পনা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল তপতী। জমির পিলার খুঁজতে খুঁজতে না পেয়ে নিখিলের মুখ যেরকম হয়ে উঠেছিল, সেই মুখের বেশি আর অনুমান করতে পারল না। তারপর সেই মুখে, শুকনো একটা হাসি ফুটে উঠতেও দেখল যখন পেশাদারী সান্ত্বনা দিয়ে অ্যাটর্নী বলল, এই সব অজুহাত খাড়া করেই সাধারণতঃও এই ধরনের উইল কনটেস্ট করা হয়। আপনি এ নিয়ে কিছু আর ভাববেন না। তাই শুনে তপতী মরীয়া চেষ্টায় নিখিলের মুখ দিয়ে বলল, —আমার স্ত্রীকে কুড়ি বছর ধরে জানি। আমি কোন সন্দেহ করছি না। তবে কি না এইরকম কথা উঠলে ওর সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। একটা বাড়ির থেকেও আমার স্ত্রীর সম্মানের দাম অনেক বেশি। বাড়ি আর আমরা চাই না। যেমন আছি তেমনিই থাকব। আপনি বরং ব্যাপারটা এখানেই শেষ করে দিন। এই বলে নিখিল বেরিয়ে এল। তপতী পরিষ্কার দেখতে পচ্ছে ওর মাথার পিছনে গোলাকার দ্যুতি। মুখে বরাভয়ের হাসি, মুহ্যমান হয়ে তপতী অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু রাত করেই নিখিল ফিরল। মুখ গম্ভীর। দরকার ছাড়া কথা বলল না। অভ্যাস মত খবরের কাগজ পড়ল না। শরীর

খারাপের অজুহাতে কিছু আহারও করল না। রাত্রে চিত হয়ে এক ভঙ্গিতে শুয়ে রইল। এক সময় হঠাৎ উঠে জানলায় দাঁড়িয়ে পর পর দুটো সিগারেট খেল। কিছুক্ষণ অন্ধকার ঘরে পায়চারী করে খাটের ধারে এসে দাঁড়াল। তপতী তখন শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করে নিজের মৃত্যু দেখার জন্য প্রস্তুত। সে নিশ্চিত বুঝে গেছে, নিখিল অ্যাটর্নীর কাছ থেকে কার্তিক মৈত্রের জবাব জেনে এসেছে।

"পরশু ডলি কি করেছে জান?"

"কি!" ধড়মড়িয়ে উঠে বসল তপতী। আপাততঃ বোধশক্তি রহিত। মাথার মধ্যে শুধু প্রচুর শব্দ ঝমঝম বেজে চলেছে। তাহলে ডলির জন্যই, আমার জন্য এই গম্ভীর বিনিদ্র পদচারণা নয়। "কি করেছে ডলি, কি করেছে?"

"আজ ব্রজেন আমার অফিসে এসেছিল, ডলি ওর স্কুলে গিয়ে ছাত্রদের কাছে, মাস্টারদের কাছে যাচ্ছেতাই করে ব্রজেনের নামে কুৎসা রটিয়েছে, ক'দিন ধরে। এমন সব কথা বলেছে যে, ব্রজেন আর মুখ দেখাতে পারছে না। যাকে ও বিয়ে করবে ঠিক করেছে, তার বাসায় গিয়েও চীৎকার গালিগালাজ করেছে, উন্মাদের মত আচরণ করে বেড়িয়েছে, ভয় দেখিয়েছে খুন করবে। তাই নয়, ব্রজেনকে রাস্তায় ইট মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে পরশুদিন।"

"এসব কি কথা! কই, বাড়িতে ওকে দেখে তো কিছুই বোঝা যায় না। ক'দিন অবশ্য মাঝে মাঝে দুপুরে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু এই জন্যই, তা বুঝব কি করে!"

"ব্রজেন আজ ডিভোর্সের মামলা রুজু করেছে।"

"ছি, ছি, এমন কাণ্ড করবে ভাবতেই পারিনি। শেষকালে মাথা পর্যন্ত ফাটিয়ে দিল!"

"শুনে অবধি লজ্জায় আমি মাথা তুলতে পারছি না। ভেবেছিলুম বাড়ি ফিরে ওকে চাবকাব।" দাঁতে দাঁত ঘষে নিখিল বলল। এই সময় তপতী অনুভব করল, অজান্তেই কখন তার হৃদয়ের এক

কোণে সুখের সঞ্চার ঘটে গেছে এবং তার ফলে ডলির প্রতি সে মমত্ববোধ করতে শুরু করেছে। ফলে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সে বলল, "না না, ওসব করতে যেও না। বেচারার মাথার ঠিক নেই, হয়তো আত্মঘাতী হয়ে বসবে। মেয়েমানুষের স্বামীর ঘরই তো জীবন।"

"আত্মঘাতী হলেই বোধ হয় এর থেকে ভাল হতো। সেটা অনেক ডিগনিফায়েড, তাতে মর্যাদা আছে। কিন্তু এসব কি, ছিঁচকাদুনেপনা! লোকে যে হাসবে।"

"লোকের হাসাহাসি দেখতে গেলে তো কোন কাজই করা চলে না।" তপতী সতর্ক এবং গম্ভীর হবার চেষ্টা করল। নিখিল আর কথা না বলে শুয়ে পড়ল। তখন তপতীর ইচ্ছা হল জিজ্ঞাসা করতে, অ্যাটর্নীর কাছে গেছল কিনা। কিন্তু ইচ্ছাটা সংবরণ করল, বুকের মধ্যে একটা শিহরণের এঁকেবেঁকে ওঠানাম অনুভব করে। তার মনে হল, এই প্রসঙ্গ উত্থাপনে ভয় আছে।

সকালে বাজার থেকে ফিরে থলিটা রান্নাঘরের দরজায় নামিয়ে রেখে নিখিল ডাকল, "ডলি।"

তপতী হলুদ বাটছিল। সেই স্বর শুনে চমকে ফিরে তাকাল। ডলি কলে জল ভরছিল বালতিতে। পায়ে পায়ে রান্নাঘরের কাছে এল।

"আমার বিনা অনুমতিতে যদি এ বাড়ির বাইরে কখনো এক পা-ও গিয়েছ, তাহলে জেনে রাখ, আর ঢুকতে পাবে না। মনে থাকে যেন।" চাপা স্বরে কথাক'টি বলে নিখিল আর দাঁড়াল না।

"কাল ঠাকুরজামাই ওঁর অফিসে গেছলেন।" ডলির বিস্ময় মোচনের উদ্দেশ্যে তপতী এইটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করল। শুনেই পাংশু হল ডলির মুখ। ধীরে সে রান্নাঘরে ঢুকে পিঁড়িতে বসল এবং কয়েক মিনিট পরই কুঁজো হয়ে ই হাঁটুর মধ্যে মুখ ডুবিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল। তপতী আর কথা বলল না।

রুবি আজও ফিরল উত্তেজিত হয়ে। "এবার আমি সোজা থানায়

য়াব। কেউ কিছু করবে না, দিন দিন তাই ছোটলোকগুলো পেয়ে বসেছে। জানো, আজ সবার চোখের সামনে রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে বলেছে, অ্যাই, পাঁচতলা একটা বাড়ি আছে, তোমার মাকে বলো না, আধাআধি বখরা যদি হয়তো ব্যবস্থা করে দিতে পারি। কি যে লজ্জা, কি যে অপমান—" দু'হাতে মুখ ঢেকে রুবি কাঁপতে শুরু করতেই তপতী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পূরবী ওকে দেখে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তপতীর বুক কেঁপে উঠল। আবার কি ভয়ঙ্কর কথা শুনতে হবে কে জানে।

"কাল তো আমাদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি ডে। রাতে তোমাদের কিন্তু নেমন্তন্ন রইল।"

হাঁফ ছেড়ে তপতী বলল, "তুমি কিন্তু ঠাকুরঝিকে বলবে, আমি বলতে পারব না ওকে। যা রেগে আছে আমাদের ওপর।"

"জানি", পূরবী মুচকি হাসল। "তিনটে ছেলে পাড়ায় তোমার নামে কি রটাচ্ছে আর বাড়ি বাড়ি তাই নিয়ে কি বলাবলি হয়, সেই কথা আমায় বলতে এসেছিল। আমি সোজা বলে দিয়েছি, কারুর কোন কথায় থাকার মত রুচি আমার নেই। আর এরকম বোগাস পাড়াতেও থাকার ইচ্ছে নেই।"

প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য তপতী আন্তরিকতা দেখিয়ে বলল, "আর কাদের বলেছ?"

"বিশেষ কাউকে নয়। আমার দুই দিদি সকালেই আসবে, রাত্রে জামাইবাবুরা আর ওঁর অফিসের তিনজন কলীগ আসবে বৌ নিয়ে। বেশি লোক বলব যে, বসবার জায়গা কোথায়। নয়তো আমার কয়েকজন বন্ধুকেও বলতাম। তাদের একজন ডাক্তার, আর একজন অ্যাডভোকেট।"

"ওমা, তাই নাকি!" তপতী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে, বিস্ময় প্রকাশ করে পূরবীকে খুশী করার জন্য কিছু প্রশ্ন করল। মনে মনে কিন্তু সে ভেবে চলল, তিনটে ছেলের, রুবির আর ডলির কথা। এই ভাবনা

সারা দুপুর ওকে ঘুমোতে দিল না।

বিকেল শুরু হওয়ামাত্র, অসময়ে নিখিল বাড়ি ফিরল। মুখ শুকনো, চোখ দুটিতে উত্তেজনা, চলনে ব্যস্ততা। এমন সময়ে ওর বাড়ি ফেরায় তপতী হকচকিয়ে বলল, "এখন ফিরলে যে, অসুখ করেছে নাকি?"

"তোমার মামার কাছে এখুনি একবার যেতে হবে। আলমারির চাবিটা দাও, একটা কাগজ বের করব।"

একটা টাইপ করা কাগজ নিয়ে, নিখিল ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েও ফিরে এল। তপতীর মুখের উপর তীক্ষ্ণ চাউনি রেখে, শান্ত স্বরে বলল, "তুমি কি বিমান মৈত্রের কাছে যেতে?"

তপতী বিন্দুমাত্রও ভাববার অবকাশ পায়নি, এই প্রশ্নটি এখন নিখিল করতে পারে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে সে দেখল প্রশ্নকারীর মুখে ভাবলেশহীন একটা মুখোশ। তখন সে বুঝল, কার্তিক মৈত্রের আপত্তির যুক্তিটি নিখিল জেনেছে। এই নিয়ে তার এতদিনের উদ্বেগ উৎকণ্ঠার সমাপ্তি ঘটল। এবার নিখিল যা ঘটাতে চাইবে তাই ঘটবে। এখন নিজে থেকে বলার কিছু নেই, কৈফিয়তের মত শোনাবে। প্রশ্নের উত্তর এবার দিয়ে যেতে হবে।

"হ্যাঁ, যেতুম। মাঝে মাঝে।" তপতী অচঞ্চল রাখল কণ্ঠস্বর।

"অবজেকসান দিয়েছে সেই কার্তিক মৈত্র। কি বলেছে জান!"

"জানি।" তপতী সহজ সুরে বলল।

"কি করে জানলে! অ্যাটর্নী আজ দুপুরে ডেকে নিয়ে গিয়ে দেখাল।"

"কার্তিক মৈত্র আমায় ভয় দেখিয়ে গেছল একদিন। বলেছিল, যেভাবেই হোক বাড়ি নিতে দেবে না। তার জন্য অধর্ম করতেও পেছ-পা হবে না। প্রোবেটের দরখাস্ত ফিরিয়ে নেবার জন্য যাতে হাইকোর্টে ছুটে যাই সেই ব্যবস্থা আগে করবে বলে শাসিয়ে গেছে, আর শুরুও করে দিয়েছে। ও ঘরে রুবি রয়েছে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পার।"

"সে কথা আমায় বলোনি কেন ?"

"কেমন যেন ভয় করল। যদি তুমি বিশ্বাস করো! যদি তুমি ক্ষেপে গিয়ে কিছু ঘটিয়ে বসো।"

মুখোমুখি দুজনে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। কথাগুলো বলে ফেলার জন্য তপতীর ভারমুক্ত, কিন্তু অবসন্ন চোখ ও কথাগুলো শুনে বিস্ময়ে এবং উত্তেজনায় নিখিলের উজ্জ্বল চোখ—পরস্পরকে পরিমাপ করার চেষ্টা করতে গিয়ে অসহায় বোধ করল। তখন তপতী আবেগ জড়ানো গলায় বলে উঠল, "তুমি কি ওই সব কথা বিশ্বাস করবে ?"

"আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু এসে যায় না।" আবেগহীন নিরাসক্ত স্বরে নিখিল বলল।

"হ্যাঁ, এসে যায়, আমার কাছে তুমিই সব। তোমার জন্যেই তো আমার বাঁচা-মরা, থাকা না-থাকা। আমার ভালবাসা এক মুহূর্তের জন্যও তোমার অমর্যাদা করেনি।"

"কুড়ি বছর প্রায় একসঙ্গে রয়েছি আমরা। এখন এসব কথা বলাবলি করতে ইচ্ছে করে না।"

"আমার করছে, ভীষণভাবে করছে।"

"বয়স তাহলে তোমাকে কিছুই দেয়নি! কিন্তু আমাকে কিছু দিয়েছে, সেগুলো নষ্ট করার ঝুঁকি আর নিতে পারব না। বয়সকে অগ্রাহ্য করার সাহস আমার নেই। আমার ভাল লাগছে না এই বয়সে তোমার সম্পর্কে এই সব কথা শুনতে। শুনলেই মনে হয়, আমি অক্ষম, কাপুরুষ, করুণার পাত্র! একথা ভাবতে ভাল লাগে না আমার।"

ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল নিখিল। জানলার ধারে এসে তপতী এক দৃষ্টে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেকে ভাববার চেষ্টা করল, বয়স তাকে কি দিয়েছে! তার দুঃখের বা সুখের অভাব কিভাবে মোচন করেছে। তার বাঁচা কিংবা মরার অভিলাষকে কতখানি বিবেচক করেছে।

ঘরের বাইরে নিখিলের উত্তেজিত কণ্ঠে তপতী ফিরে তাকালো।

শুনতে পেলো, রুবি বলছে, "প্রতিবাদ করলে তো ওরা আরো গোলমাল করার সুযোগ পাবে।"

"কে বলেছে তোকে। ওরা স্বভাবে কেঁচো, রুখে দাঁড়ালেই গুটিয়ে যাবে। বেশ, কাল আমি থাকব। কি করে আর কি বলে আমি দেখব। ক'টার সময় কলেজ থেকে ফিরবি?"

"দশটা বেজে যায়।"

"কাল নয় দেরীতেই অফিস যাব। এই সব ব্যাপার আর একদিনও চলতে দেওয়া উচিত নয়।"

শুনতে শুনতে তপতীর মনে হল, বয়স কিছুই দেয়নি নিখিলকে। ওর ভিতরের ফাটলগুলো শুধু দীর্ঘই হয়েছে। ধাক্কা দিলেই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে, আর অন্ধের মত যেন প্রবল ধাক্কার দিকেই ও এগিয়ে যেতে চায়।

রাত্রে তপতী নিখিলের কোন সাড়া পেল না। বিছানার একধারে সরে গিয়ে সে গত কুড়ি বছরে প্রথম অনুভব করল, নিখিল সম্পর্কে সে নিজেও ক্লান্ত।

॥ নয়

সকাল থেকেই পূরবী ব্যস্ত বিবাহবার্ষিকীর রান্নার তোড়জোড়ে। ডলি তাকে সাহায্য করছে। দুপুর থেকে রান্না শুরু হবে। রুবি কলেজ গেছে। বাজার করে দিয়ে প্রতুল বেরিয়েছে পূরবীর দুই দিদিকে আনতে। তপতী রান্নাঘরে একা, ভাত খেয়ে নিখিল দোতলায় অপেক্ষা করছে। দশটায় বেবোবে। গলি আর বড় রাস্তার মোড়ে অন্য দিনের মত আজও তিনটে ছেলে আসবে। নিখিলও থাকবে। তারপর···সকাল থেকে তপতী কাজে মন বসাতে পারছে না। ইতিমধ্যে কয়েকবার সদর দরজা থেকে উঁকি দিয়ে রাস্তাটা দেখে এসেছে। মোড়ের রকে দুটি মাত্র ছেলে। দোতলার

বারান্দাগুলো ফাঁকা। রবারের বল খেলছিল যে ছেলেরা, তারা নেই। টিউবওয়েলে জল নিতে দাঁড়িয়ে তিনজন। একটা বেলুনওলা লাঠির মত সরু বেলুন টেনে কর্কশ শব্দ করতে করতে চলে গেল। কয়েকটি বাচ্চা ছুটে এল রাস্তায়।

অফিস যাওয়ার ধুতি-পাঞ্জাবি পরেই নিখিল নেমে এল। হেস্তনেস্ত করেই অফিস রওনা হয়ে যাবে। অন্যদিনের মত আজ চোখেমুখে ব্যস্ততা নেই। হাতঘড়ি দেখে ভ্রূ কুঁচকে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়ান তপতীকে বলল, "কি যেন আনতে হবে বললে?"

"এক জোড়া বেলফুলের মালা।"

"অফিস থেকে কখন বেরোব ঠিক নেই, রুবিকে দিয়ে বাজার থেকে আনিয়ে নিও বরং।"

নিখিল বেরিয়ে যেতেই তপতী সদরে এসে দাঁড়াল। রাস্তাটা একই রকম। লোকেরা নিজের মনে হেঁটে যাচ্ছে। নিখিলের লম্বা দেহ সামনে ঝুঁকে, বড় বড় পা ফেলে মোড়ের দিকে চলেছে। একটা রিক্সা আসছে, নিখিল দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। রিক্সায় দুজন আরোহিনী, একজনের কোলে নবজাতক। বোধ হয় হাসপাতাল থেকে আসছে। তপতী ওদের দেখায় ব্যস্ত ছিল, রিক্সাটি তাকে অতিক্রম করে যাবার পর সামনে তাকিয়ে নিখিলকে আর দেখতে পেল না। মোড়টা আগের মতই ফাঁকা অর্থাৎ শুধুই লোক চলাচল করছে।

তপতী অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করল। এলোমেলো নানান চিন্তার মাঝে, ঘুরে ফিরে সে ভাবল, আজ যদি ছেলেগুলো না আসে তো ভাল হয়। সবদিনই তো ওরা আসে না। কিংবা রুবি যদি আজ পিছনের বস্তির গলিটা দিয়ে আসে। মাঝে মাঝে স্কুলে পড়ার সময় তো আসত। বা, নিখিল যদি দেরী হয়ে যাচ্ছে দেখে অফিস চলে যায়। তারপরই ওর মনে হল, এর কোনটিই আজ ঘটবে না। অর্থাৎ রুবি ঠিকই রোজকার পথ ধরেই আসবে, সঙ্গে থাকবে ক্লাশের চার-পাঁচটি বন্ধু। ছেলেগুলো ঠিকই দাঁড়িয়ে থাকবে আর শুনিয়ে

শুনিয়ে বলবে। আর নিখিলও তাইতে রাগে ঠকঠক করে কেঁপে উঠে—

ঝিমঝিম করে উঠল তপতীর আপাদমস্তক। চোখ দুটো সরু করে আবার সে মোড়টাকে লক্ষ্য করল। নিখিল বা ছেলেগুলো কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। তাহলে কি আজ অন্য কোথাও দাঁড়িয়ে আছে? কিন্তু ওদের উদ্দেশ্য তো পাড়ার লোকেদের শুনিয়ে দেখিয়ে অপমান করা। দূরে গিয়ে ওদের কি লাভ! নিশ্চয় মোড়েই থাকবে। কিন্তু ওরা জানে না, একজন আজ পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জানলেও হয়তো পরোয়া করবে না। এসব ছেলেরা হাঙ্গামা ভালবাসে। ওরা নিখিলকে দেখে কি ভয়ে পালিয়ে যাবে? কেঁচো হবে? কে জানে। তপতী এই ধরনের ছেলেদের একদমই বুঝতে পারে না।

হঠাৎ একজনকে দেখতে পেল তপতী। কালো আঁটো ট্রাউজার্স আর সুতীর রঙিন গেঞ্জী। চুলগুলো ঘন, কপালের সামনে খানিকটা বেরিয়ে রয়েছে। পাছা আর তলপেট প্রায় সমান। ওকে দেখে তপতীর মনে হল, এর মত তিনটেকে নিখিল তিন চড়ে শুইয়ে দিতে পারবে। কিন্তু বাকি দুজন কোথায়। একটা বাড়ির একতলায় জানলার পাল্লা খুলে গেল, ফলে তপতীর দৃষ্টি থেকে মোড়ের প্রায় আধখানা বাদ পড়ল। কিন্তু রঙিন গেঞ্জী পরা ছেলেটির ভাবভঙ্গি দেখে তার মনে হচ্ছে, সে একা নয়। তপতী সমগ্র মোড় এবং দুধারের ফুটপাথ দেখার জন্য সদর থেকে রাস্তায় নামল।

ঠিকই মনে হয়েছে তার। তবে তিনজন নয়, চারজন। শাদা সার্ট পরা একজন পিছন ফিরে রয়েছে। তপতী বাবলুকে চিনল, গোড়ালি তুলে ফুটপাথে উবু হয়ে বসে সিগারেট খাচ্ছে আর মুখ তুলে কথা বলছে হেসে হেসে। বড় রাস্তা দিয়ে বহু লোক যাতায়াত করছে। কিন্তু শাদা পাঞ্জাবিপরা একটি দীর্ঘ দেহ তপতী দেখতে পাচ্ছে না।

বাবলু উঠে দাঁড়াল। বাকি তিনজনের দুজনকে এখন দেখা

যাচ্ছে, আর একজন কোথায় যেন চলে গেছে। ওরা নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করল বলে তপতীর মনে হল। এত দূর থেকে চলাফেরা বা হাত-পা নাড়া দেখে অনুমানে সে বুঝল, রুবি আসছে।

খয়েরি ছাপা শাড়ি, ওই রঙেরই ব্লাউজ। রুবি ঘাড় হেলিয়ে সঙ্গের দুটি মেয়ের কাছ থেকে বিদায় নিল। এইবার গলিতে ঢুকবে। একবার ডানদিকে তাকিয়ে কি যেন দেখেই থমকে গিয়ে মুখ নিচু করে হাঁটার বেগ দ্রুত করল। তপতী অনুমান করল, তাহলে নিখিল ডানদিকেই কোথাও রয়েছে। রুবি মোড় পার হচ্ছে। ওর বাঁদিকে, ফুটপাথের কিনারে তিনজন ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়িয়ে। রুবি ফ্যাকাসে মুখে ওদের অতিক্রম করে যাবার সময়, মুখটা এগিয়ে রঙীন গেঞ্জীপরা ওকে কিছু যেন বলল। বাবলু রাস্তায় নেমে রুবির পিছন পিছন হাঁটতে শুরু করল। এক পথচারী বিস্মিত চাহনি রুবি এবং বাবলুর উপর নিক্ষেপ করায় তপতী অনুমান করল, অস্বাভাবিক কোন কথা বাবলু বলেছে।

অন্য দিনের মত রাস্তাটা আজও তার নিজস্ব শব্দ, বর্ণ, ব্যস্ততা ও আলস্য নিয়ে সকাল দশটার মতই হয়ে আছে। কিন্তু তপতীর চোখে এই মুহূর্তে রাস্তাটা ধু ধু প্রান্তর হয়ে গেল। প্রবল নৈঃশব্দ্য ও অগাধ নির্জনতার মধ্য দিয়ে শুধু রুবি এগিয়ে আসছে। তার পায়ের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। তপতী দেখল রুবির দু' চোখে ভয়। সে চেঁচিয়ে বলতে যাচ্ছিল, ছুটে আয় রুবি, ছুটে আয়, আর তখনি চমক ভেঙে দেখল, নিখিল যেন মাটি ফুঁড়েই ছিটকে উঠল। দু' হাতে দুটি ছেলের জামার কলার ধরে ঝাঁকাচ্ছে আর কি যেন বলছে। ছেলে দুটি আচমকা আক্রমণে বেসামাল। বাবলু থমকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, রুবিও। রাস্তার কিছু লোক বিস্মিত, গতিহীন। নিখিল দুজনকে ছুঁড়ে দিল সামনে। একপা এগিয়ে এসে লম্বা হাত বাড়িয়ে চড় কষাল বাবলুকে। টাল সামলে গালে হাত চেপে যেভাবে সে তাকাল, এত দূর থেকেও তপতীর কাছে সেই দৃষ্টি খুনীর বলে মনে হল।

নিখিল তার শীর্ণ দীর্ঘ দেহটি সোজা রেখে দু' হাতের তালু থেকে ধুলো ঝাড়ার ভঙ্গি করে যখন উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে কিছু বলায় ব্যস্ত, তখনই ডানদিক থেকে শাদা সার্ট পরা একজন ছুটে এসে নিখিলের তলপেটে লাথি মারল। কুঁজো হয়ে কয়েক পা হটে গিয়ে বিভ্রান্তের মত নিখিল তাকাল। লাথি মারবে, সেটা যেন নিয়মের বাইরের ঘটনা, বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না। নিখিল তার দু'ধারের লোকেদের দিকে তাকাল, উপর দিকে তাকাল তারপর কোমরে হাত দিয়ে তাকাল তার বিস্ময় উৎপাদনকারীর দিকে।

তপতীও তাকাল এবং এক চোখ গলে যাওয়া, ঝলসানো বীভৎস মুখটি দেখে, হতাশ হয়ে মনে মনে বলল, তাহলে ও ভোলেনি। ভেবেছিলাম, হয়তো শোধ নেবে না।

রুবি থরথরিয়ে কাঁপছে। বারান্দায়, জানলায় সারিসারি মুখ। ঘটনার আকস্মিকতার ঘোর কাটিয়ে কয়েকজন এগিয়ে আসছিল নিখিলের সমর্থনে। বাবলু চীৎকার করে উঠল, "খবরদার। যে শালা ওকে সাপোর্ট দিবি, খতম করে দোব।" প্রায় ছয় ইঞ্চি ফলার একটা ছুরি ওর হাতে ঝলসাচ্ছে। যারা এগিয়ে আসছিল, দ্রুত পিছিয়ে ভিড়ে মিশে গেল। ভিড়টাও কাপুরুষোচিত ভঙ্গি লুকোবার কোন রকম চেষ্টা না করেই দুদ্দাড় বেগে নিরাপদ দূরত্বে সরে গেল। দোতলা থেকে এক বৃদ্ধ চেঁচিয়ে বলল, "পাড়ার মধ্যে এসব কি গুণ্ডামি হচ্ছে? পুলিশ ডাকো তো কেউ।"

"ডাক্ তোর পুলিশকে।" বাবলু তেড়ে গেল ভিড়ের দিকে, "সাফ্ করে দিয়ে যাব। পাড়া জ্বালিয়ে দোব।"

ইতিমধ্যে বাকি তিনজন নিখিলকে ঘিরে ধরল। পিছন থেকে একজন কাঁছা টেনে খুলে দিতেই সে ঘুরে তাকে ধরবার জন্য হাত বাড়াল, আর একজন সেই মুহূর্তে ওর পাছায় লাথি কষাল। নিখিল রকের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়তেই, ওরা ঝাঁপিয়ে এল।

তপতী ছুটে এসে পৌঁছবার আগেই, রক থেকে গড়িয়ে রাস্তার উপর নিখিলের দেহ চিত হয়ে পড়ে গেল। ধুতিটা খুলে গিয়েছে,

পাঞ্জাবিটা বুক থেকে ফালা করে দেওয়া। ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জিটা দেখা যাচ্ছে। পায়ে একপাটি জুতো। ওরা চারজন একটু তফাতে, নিখিলের উঠে দাঁড়ানর অপেক্ষায়। দেহটা কাত করে কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠবার চেষ্টা করছে নিখিল, সেই সময়ই তপতী পৌছল। রুবি একদৃষ্টে সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে। পলক পড়ছে না চোখের। এখন সে আর কাঁপছে না।

তপতী দু' হাতে নিখিলের গলা জড়িয়ে তোলবার চেষ্টা করতেই ডান হাতে ঝটকা দিল নিখিল। চাপা গলায় বলল, "সরে যাও, সরে যাও। আমি নিজে উঠব। তুমি এখানে কেন এলে ? এদের শায়েস্তা করে ছাড়ব।"

"বটে, এখনো রোয়াব! শালা বৌকে টোপ করে আস্ত একটা বাড়ি গেঁথে, আবার রোয়াব দেখান হচ্ছে ?" ছুরিটা নিখিলের পেটের কাছে ধরতেই তপতী চীৎকার করে দুহাত বাড়িয়ে ছুরিটা ধরতে গেল। চকিতে সরে গেল বাবলু। নিখিল উঠবার জন্য রাস্তায় দু' হাতের ভর দিয়ে হাঁটু ভেঙে পিঠটাকে বাঁকিয়ে উঠতে যাচ্ছে, তখন একজন ওর পিঠে পা রেখে চাপ দিয়ে রাস্তায় উপুড় করে শুইয়ে দিল। ঘাড় ফিরিয়ে নিখিল দেখবার চেষ্টা করল, কে তার পিঠে পা চেপে রেখেছে। চোখ দুটো অসহায় রাগে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, ঠোঁটের কস বেয়ে রক্তের ধারা। হঠাৎ একটা অমানুষিক বুকফাটা চীৎকার করে, দেহের শেষ বিন্দু ক্ষমতার প্রয়োগ দ্বারা নিখিল উঠে দাঁড়াল, ছিলেছেঁড়া ধনুকের মত। দূরের ভিড় থেকে সমবেদনা ও সহানুভূতিসূচক ধ্বনি উঠল মৃদু স্বরে। চারজন অচঞ্চল ভঙ্গিতে অপেক্ষা করছে। তপতী জড়িয়ে ধরল নিখিলকে। "তুমি কি পাগল হলে! আর নয়, এবার ফিরে চলো। দেখ, কতলোক জড়ো হয়ে দেখছে। তুমি পারবে না, এদের সঙ্গে পারবে না।"

ছেঁড়া পাঞ্জাবি আর আণ্ডারওয়্যার পরা, একপাটি জুতো পায়ে দীর্ঘ দেহটিতে উদ্ধত ভঙ্গি আনবার প্রাণপণ চেষ্টা করে, অবশেষে নিঃশ্বাস নিতে, মুখ তুলে হাঁ করল নিখিল। হাঁটু দুটো কেঁপে কেঁপে

উঠছে। তলপেটে হাত রেখে যন্ত্রণায় মুখবিকৃতি করে মাথা ঝাঁকাল। "পারব না কে বলল?" নিখিল ঘোলাটে চোখে ভিড়ের দিকে তাকাল। এগোতে গিয়ে টলে উঠেই, আবার তলপেট চেপে ধরে চারজনের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তপতী দেখল, ওরাও নিখিলের দিকে তাকিয়ে, কিন্তু ওদের চোখে শানিত হিংস্রতার বদলে এখন যেন ম্লান দুঃখের আভাস। শুধু সেই একচক্ষু, গলিতচর্ম মুখটি, যে শুধু তলপেটে লাথি মারা ছাড়া আর কিছুই করেনি, রুবির দিকে তাকিয়ে। তপতীর মনে হচ্ছে, ওর নষ্ট চোখ দিয়ে যেন অশ্রু ঝরছে, ভাল চোখে বিদ্রূপের অট্টহাসি। ফলা মুড়ে বাবলু ছুরিটা পকেটে রাখল। নিজেদের মধ্যে ইশারায় ওরা কথা বলল।

অন্ধের মত দু' হাত বাড়িয়ে টলতে টলতে নিখিল এগোতেই তপতী ওর সামনে দু' হাত মেলে দাঁড়াল। ভিড়ের মধ্য থেকে কয়েকজন এগিয়ে এসে নিখিলকে ঘিরে ধরল তখন।

"চলুন নিখিলবাবু, বাড়ি চলুন। ওরা গুণ্ডা, ওদের সঙ্গে কি মারামারি করে পারবেন! দেখুন তো কি অবস্থা করেছে।"

"ডাক্তারখানায় নিয়ে যান। দেখছেন না, তলপেট চেপে ধরে কেমন করছেন। লাথি মেরেছে ওখানে। উফ্, দিনের বেলাতেই একটা লোককে প্রকাশ্য রাস্তায় কিভাবে মারল! কোথায় আছি রে বাবা।"

"শুধু শুধু কি আর এটা ঘটল। কারণ আছে নিশ্চয়। শুনলেন না কি বলে চেঁচাচ্ছিল গুণ্ডাটা।"

ধীরে ধীরে গলিটা আবার, ভয় থেকে বেরিয়ে আসার অব্যবহিত পরের উত্তেজনার প্রভাবে কলরবমুখর হয়ে উঠল।

"আপনারা সরে যান আমার সামনে থেকে।" নিখিল চীৎকার করে বলতে গিয়ে পারল না।

"আপনাদের সাহায্যের দরকার নেই আমার।" রাশভারি স্বরে বলতে গিয়েও পারল না।

হাঁফিয়ে হাঁফিয়ে বলল, "আমি জানতে চাই ওরা কেন আমার

স্ত্রীকে, মেয়েকে অপমান করেছে। ওদের চামড়া তুলে নেব আমি। অপবাদ দেবে? কেচ্ছা রটাবে? কেন, কি জন্য?"

"চামড়া-টামড়া পরে তুলবেন, এখন বাড়ি চলুন তো।" নিখিলকে ধরে একজন বাড়ির দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। ক্রুদ্ধ চোখে নিখিল তাকাল তার দিকে। তপতী ফিসফিস করে বলল, "ওরা চলে গেছে। এখন আর থেকে কি হবে, চলো, এই চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে ভিড় আরো বাড়বে।"

তপতী ভিড়ের দিকে তাকিয়ে প্রতুলকে দেখতে পেল। বিব্রত মুখ। সঙ্গে দুজন সম্পন্ন চেহারার মহিলা। অন্যান্য দর্শকদের মত প্রতুলও তাকাচ্ছে নিখিলের দিকে। হাতের তালু উপুড় করে মহিলাদের সে কিছু বলল, তারা ঠোঁট মুচড়ে ভ্রূ তুলে বিস্ময় প্রকাশ করল।

নিখিল বাড়ির দিকে যাচ্ছে। একটি ছেলে জুতোর পাটিটি কুড়িয়ে এনে দিল। গলির প্রত্যেক বাড়ির সদর দরজায়, ছাদে, বারান্দায়, জটলা ও বিস্মিত চাহনি। পিছু পিছু একদল বাচ্চা ছেলে আসছে, তাদের সঙ্গে রুবিও। দোতলা থেকে একটি বছর পাঁচ-ছয়ের কচি গলা অবাক স্বরে বলে উঠল, "ওমা, দেখো দেখো, অত বড় লোক দাদার মত প্যাণ্ট পরেছে।" "আঃ বৌমা, চুপ করাও না।" চাপা ধমক দিল এক প্রৌঢ়া।

দুই কাঁধ ঝুলে পড়েছে। মাথা নামিয়ে, অসংলগ্ন পদক্ষেপে নিখিল বাড়ির সদরে পৌঁছল। পূরবী আর ডলি দাঁড়িয়ে। কথা না বলে ওরা পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল। প্রতিভা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তপতীকে জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে নিখিলের?"

"কিছু না।" নিখিলই জবাব দিল। মুখ ফিরিয়ে পূরবী আর ডলির দিকে তাকিয়ে হাসবার চেষ্টা করল, ঠোঁট দুটি ফুলে উঠেছে। ফাটা গালে রক্ত জমে কালো রঙ ধরেছে। দেয়াল ধরে ধরে সে উপরে উঠে গেল।

পূরবী কিছু বলতে যাচ্ছিল ডলিকে, সদরে চোখ পড়তেই ছুটে

গেল, "বড়দি! এত দেরী হল যে আসতে? কি যে সব ছোটলোকি কাণ্ড হয়ে গেল এইমাত্র কি বলব, মেজদি উপরে আয়। নবু, টুলুকে আনলি না কেন?"

তপতী ঘরের জানলাগুলো বন্ধ করে দিল। সামনের বাড়ির জানলায় কৌতূহল ঠেলাঠেলি করছে বলেই নয়, অন্ধকার করে দিলে নিখিলের চোখে চোখ পড়ার সম্ভাবনাও আর থাকবে না। ওর দেহ থেকে ছেঁড়া পাঞ্জাবিটা খুলে দিতে গিয়ে চোখে চোখ পড়ায় তপতী দেখে, শিশুর বিস্ময় ও অসহায়তা নিয়ে নিখিল তাকিয়ে। চোখ সরিয়ে নিয়ে জানলাগুলো বন্ধ করার সময় তার বুক কেঁপে উঠেছিল। রুবি তার ঘরে দরজা বন্ধ করে কি করছে কে জানে। এখন কি করবে, ভেবে ঠিক করতে না পেরে তপতী ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে নিখিলের শায়িত দেহের অস্পষ্ট আয়তনের দিকে তাকাতেই আগাছা ঢাকা একখণ্ড জমি দপ্ করে চোখে ভেসে উঠল। তিন কোণে তিনটি পিলার, চতুর্থ কোণটি শূন্য।

সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিতদের আগমনে পূরবীর ঘরে কলহাস্য শুরু হল যখন, তপতী তার ঘরের দরজা বন্ধ করে আলো জ্বালতেই নিখিল মুখ ফেরাল। তপতী দেখল ওর দু'চোখ থেকে ক্রোধ আর অপমানের জ্বালা তীব্রবেগে নির্গত হচ্ছে। এতক্ষণেও একটি শব্দ মুখ থেকে বেরোয়নি। চিত হয়ে একই ভঙ্গিতে শুয়ে আছে। মাঝে প্রতুল একবার জিজ্ঞাসা করে গেছে, ডাক্তার আনতে হবে কিনা। তখন নিখিল হাত নেড়ে নিষেধ করে চোখ বন্ধ করেছে। পূরবী ডাকতে এসেছিল খাবার জন্য, তপতী অনিচ্ছা জানিয়ে প্রত্যাখ্যান করে। রুবি দরজাই খুলল না।

নিমন্ত্রিতরা চলে যাবার পর, বাড়িটা এক সময় যখন অন্ধকার হয়ে গেল, তপতী ঘর থেকে বেরিয়ে দালানে এসে দাঁড়াল। কিছু পর, খুট করে শব্দ হতেই চমকে ফিরে দেখল দরজা খুলে রুবি ঘর থেকে বেরোচ্ছে। ওকে দেখে রুবি এগোল না। এই নৈঃশব্দ্যের ব্যবধানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল তারা। অবশেষে রুবি ধীর বিষণ্ণ স্বরে বলল,

"এই ঘটনার জন্য আমিও দায়ী। আমি কাল থেকে আর কলেজ যাব না। তুমি আমার বিয়ে দিয়ে দাও, যত তাড়াতাড়ি পার।"

তপতী তখন অন্যমনস্কের মত চতুর্থ কোণের আগাছা সরাতে সরাতে ভাবছে—কিসের জন্য, দুঃখের না সুখের জন্য এই সন্ধান?

॥ দশ ॥

"বাণী, আমি এলুম রে, দিনকতক থাকব তোর কাছে।" দরজা খোলামাত্র তপতী হাসতে হাসতে বলল।

অবাক হয়ে বাণী তাকিয়ে। সবে মাত্র ভোর হয়েছে। ওর চুলে ও বস্ত্রে সদ্য ঘুমভাঙার চিহ্ন, তপতীর মুখে ঘুম না হওয়ার।

"অসুবিধে হবে না তো?" তপতী উদ্বিগ্ন চোখে তাকাল।

"তপু! এত ভোরে! কি ব্যাপার?" বাণীর ঘুমের এবং বিস্ময়ের আচ্ছন্নতা ধীরে ধীরে কাটছে। "বাইরে কেন, আয় আয়, ঘরের মধ্যে আয়।"

ঘরটি বেশ বড়। একধারে খাটের উপর বাণীর ছেলেটি ঘুমোচ্ছে। আয়না লাগানো একটি কাঠের আলমারি, দুটি ট্রাঙ্ক, সুটকেশ, আলনা, টেবিল, দুটি চেয়ার আর বইয়ের একটি ছোট্ট র‍্যাক ছাড়া ঘরটিতে আসবাব কিছু নেই। বিন্যস্ত, পরিচ্ছন্ন একটি আবহাওয়া ঘরে বিরাজ করছে। তপতী কাঁধ থেকে খদ্দরের ঝুলিটি নামিয়ে খাটে রাখল। রুবি কিছুদিন কলেজে বই নিয়ে যাবার জন্য এটি ব্যবহার করেছিল। ঝুলির মধ্যে তপতী কয়েকটি বস্ত্র এনেছে।

"অসুবিধে যদি হয় তো, বলতে লজ্জা করিসনি।"

"আমার আবার কিসের অসুবিধে, মা-ছেলের তো সংসার, বরং তোরই অসুবিধে হতে পারে। কিন্তু হঠাৎ এত ভোরে এইভাবে এলি যে?" বাণী হাসিমুখ গম্ভীর করে প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দান করল। তপতী জানত এই প্রশ্নটির সম্মুখীন হতেই হবে। একটা উত্তরও তৈরী

করে রেখেছে সে। মুচকি হেসে, রহস্যের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, "পরে বলবখন। এমন কিছু সিরিয়াস ব্যাপার নয়। তুই তো স্কুলে যাবি, ফিরবি কখন ?"

"পাঁচটা নাগাদ। স্কুল থেকে বাবলুকে নিয়ে ফিরতে হয়। ও আলাদা স্কুলে পড়ে।"

'বাবলু' নামটা শুনেই তপতীর ভিতরটা কয়েক মুহূর্ত শক্ত হয়ে রইল। ঘাড় ফিরিয়ে ঘুমন্ত বাবলুর দিকে তাকাল সে। ছেলেটি মায়ের মতই শ্যামবর্ণ, হৃষ্টপুষ্ট। নাকটি টিকোলো। কনুই থেকে দড়ির মত শিরা পুরো বাহুর দিকে নামেনি। গালদুটি তোবড়ান নয়, চুলও কদম ছাঁটের নয়—তপতী ভরসা করে বাবলুর পায়ে হাত রেখে বলল, "তোর ছেলেটি বেশ সুন্দর হয়েছে, তোর মতই।"

"থাক্ থাক্, মিথ্যে কথা এই বয়সে আর বলতে হবে না তোকে। একটু বোস্ স্টোভটা ধরাই।" পুলক সামলাতে সামলাতে বাণী ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের রান্নাঘরে ঢুকল।

তপতী হঠাৎ অসহায় বোধ করল। মনের মধ্যে যে প্রশ্নটা শেষরাত থেকে এতক্ষণ চাপা ছিল সেটা পাথরের মত ভার হয়ে তাকে এখন দমিয়ে দিচ্ছে। ঠিক করলাম কি ? উচিত হল কি এই কাজ ? বাড়ি থেকে বেরোবার আগে সে ভেবেছিল, মামার কাছেও যাওয়া যায়। কিন্তু তারা নিজেরাই দুবেলা কুলিয়ে উঠতে পারে না, তাদের ঘাড়ে বোঝা হয়ে কিছুতেই চাপা যায় না। তাছাড়া, কারণ হিসেবে সে বলবেই বা কি ? কোথাও আর দাঁড়াবার জায়গা নেই, এই ভেবে দিশেহারা হতে হতে বাণীর কথা তখন মনে পড়ে। এবং তারপর আর কিছু সে ভাবেনি। কিন্তু এখন, প্রাথমিক উত্তেজনা কেটে যাবার পর তপতীর মনে হচ্ছে, সংসার ফেলে এইভাবে বেরিয়ে না এলেই কি চলত না ?

সারা দেহে যেন লোহা বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার ভার বইতে না পেরে তপতী বাবলুর পাশে বিছানায় শুয়ে পড়ল। বালিশে মিষ্টি গন্ধ। বাণী বিধবা হলেও চুলে গন্ধ তেল মাখে। চোখ

বুজে শুয়ে, তপতী হঠাৎ ঈর্ষা বোধ করল। বাণীই সুখে আছে। কুচকুচে কালো, খোঁড়া, বাণীর জন্য পাত্র পাওয়া যাচ্ছিল না। বিয়ের বয়স পেরিয়ে যায়-যায়, তখন পাওয়া গেল এক প্রৌঢ় দোজবরেকে। বাণীর বিয়ের খবর পেয়ে, দীর্ঘশ্বাস মোচড় দিয়ে তপতীর বুক থেকে বেরিয়েছিল। ওর বিধবা হবার সংবাদে মন ভার হয়ে গেছল। বাণীই ছিল বন্ধুদের মধ্যে অন্তরঙ্গ।

"ঘুমোলি নাকি ?"

ধড়মড়িয়ে তপতী উঠে বসল। চায়ের কাপ হাতে বাণী দাঁড়িয়ে।

"বড্ড ঘুম পাচ্ছিল।" তপতী হাত বাড়িয়ে কাপটা নিল। "দোকানবাজার করে কে তোর ?"

ছেলেকে ঘুম থেকে তুলতে তুলতে বাণী বলল, "আমি নিজেই করি। আমিষের পাট তো নেই। সন্ধ্যেবেলা বাজারে ভিড় থাকে না, তখন যাই। বাসন তো সামান্য, নিজেই মেজে নিই।"

বাবলু অবাক হয়ে তপতীকে দেখছিল। হাত বাড়িয়ে ডাকতেই সরে গিয়ে মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। বাণী বলল, "তোমার মাসী হয়, তপু-মাসী। আমাদের কাছে থাকবে।" বাবলু তারপরও অনড় হয়ে রইল। তপতীর আর এখন উৎসাহ নেই বাৎসল্যরসের প্রদর্শন দ্বারা বাণীকে কোমল করতে। এতই ক্লান্ত।

"এই প্রথম ও একজন মাসী দেখল। পিসী-মাসীরা কেউ তো আসে না।" বাণী টুথব্রাশে পেস্ট মাখাতে মাখাতে, তপতীকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতে দেখে এবার কণ্ঠস্বর তির্যক করে বলল, "মা-র জন্য পিতৃকুল মাতৃকুল সব হারিয়েছে ছেলেটা।"

বাবলু দাঁত মাজায় ব্যস্ত হতেই বাণী আবার বলল, "স্কুল থেকে ফিরে সব বলব। সকালে এক সেকেণ্ডও ফুরসত নেই আমার। ভাড়াটে বাড়িতে জলকলের যে কি ঝামেলা। তুই কি বাথরুমে যাবি ?"

"বড্ড ঘুম পাচ্ছে, একটু ঘুমোব।"

"তাহলে ঘুমো। দেখে তো মনে হচ্ছে তিনচার রাত ঘুমোসনি। ঝগড়া-টগড়া ?"

এমনভাবে তপতী হাসল, যার অর্থ আবিষ্কারের দায় প্রশ্নকারীর উপরই এসে পড়ে। বাণী আবার বলল, "মনে হচ্ছে গুরুতর ঝগড়া। বাব্বাঃ, বিয়ের এতদিন পরেও দেখছি তোদের টানাটানির বহর কমেনি।"

হেসে শুয়ে পড়ল তপতী। চোখদুটো জ্বালা করছে। বন্ধ করেও কমল না। চোখে মুখে জল দিলে হয়তো কমবে, এই ভেবে সে ঘর থেকে বেরিয়ে, উঠোনে এসে দাঁড়াল। একটি কিশোরী কল থেকে বালতিতে জল ভরছে। অপেক্ষায় থাকার সময় তপতীর মনে পড়ল, সে এই বাড়িরই বৌ, এক সময় এইটাই ছিল শ্বশুরবাড়ি। নিখিল এখনো মনে করে সে এই বাড়িরই ছেলে। চালচলনে সেই ভাবটাই বজায় রাখতে চায়। এখন যদি জানতে পারে এই বাড়িরই ভাড়াটেদের একজনের ঘরে তার বৌ আশ্রয় নিয়েছে, তাহলে কি করবে ?

চোখে জল দিয়ে তপতী ঘরে এসেই আবার শুয়ে পড়ল। পাঁউরুটি চিবোতে চিবোতে বাবলু তাকিয়ে রইল ওর দিকে। তপতী চোখ সরিয়ে চিত হয়ে দুটি হাত আড়াআড়ি কপালের উপর রাখল। কি কাজে যেন বাণী ঘরে ঢুকল। হাতের ফাঁক দিয়ে তপতী দেখল পায়ের কাছের আলমারিটা বাণী খুলল, একটা কৌটো বার করে, আয়না বসানো পাল্লাটা বন্ধ করল। চাপা গলায় বাবলুকে পড়া শুরু করার নির্দেশ দিয়ে, তপতীর দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেল।

তপতী আয়নাটা থেকে আর চোখ সরাল না। নিজের শায়িত দেহ সে সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছে। এইবার ভারী হয়ে আসছে চোখের পাতা। বাবলুর পদ্য মুখস্থ করার সুরে তন্দ্রা লাগছে। মাঝে মাঝে বাণী ঘরে আসছে যখন, তপতী চোখ খুলে আয়নায় একটা শায়িত দেহ দেখেই ঝিমঝিমে নেশার মত অনুভবে আচ্ছন্ন হয়েছে। আধ-ঘুম আধ-জাগরণের মধ্যে তার মনে হচ্ছে, ওই আয়নায় দেখা দেহটি ভূপতিত একটি বিরাট অশ্বত্থের পরিত্যক্ত শাখা। একদা এই

বৃক্ষের শাখায় শাখায় নানান স্মৃতি ছড়িয়ে রয়েছিল। কিন্তু এই পরিত্যক্ত শাখাটি কোন স্মৃতি বহন করছে—দুঃখের না সুখের, দুঃখের না সুখের? দুঃখের সুখের দুঃখের। তপতী আন্দোলিত হচ্ছে। দ্রুত যেন ভেসে চলেছে ভাঁটার টানে দুঃখের স্মৃতির দিকে। চাপা, মন্থর একটি স্বর স্রোতের মত কানে বাজছে। ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে হয়ে হাহাকারে পরিণত হচ্ছে—"আমি আর পারব না। তাহলে আমি আর পারব না।"

তপতী কখনো শোনেনি এমন স্বরে নিখিলকে কথা বলতে। "আর পারব না" শব্দ ক'টি ঘণ্টাধ্বনির মত তপতীব বুকে বাজতে থাকল। তার কম্পনরেশ প্রবল এক আবেগের দিকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

"কেন পারবে না?"

"মেয়ের সামনে, বৌয়ের সামনে যখন লাথি খেলুম, তখনই বুঝলুম আমার জীবনের সেরা সময় চলে গেছে। নিজের মর্যাদা রক্ষা করার ক্ষমতা আর আমার নেই।" বলতে বলতে নিখিল পূরবীদের সন্থ-ফেলে-যাওয়া ফাঁকা ঘবের মধ্য থেকে সরে গিয়ে জানলার ধারে এসে দাঁড়াল। রাস্তার আলো গরাদের ছায়া ফেলল ওর মুখের মাঝখানে। তাতে দু' টুকরো হয়ে গেল মুখটা। তপতী হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করতেই চমকে উঠল নিখিল। ছায়াটা এবার ওর একটা চোখ ঢেকে দিল। অন্য চোখটা বীভৎস চাহনি নিয়ে ফিরল তপতীর দিকে।

"কিন্তু এত সহজে আমি শেষ হব না। হওয়া সম্ভব নয়। লড়ব, শেষ পর্যন্ত আমি লড়ে যাবই। শুধু একটাই ভয়, সবকিছু পণ্ড করে দিতে পার তুমি।" দু' হাতে তপতীর দুই কাঁধ আঁকড়ে নিখিল বলল, "তুমি কি আমার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে পার?"

"হ্যাঁ, পারি।" স্থির গলায় তপতী বলল।

"কেন?"

"তোমায় ভালবাসি বলে।"

"যা বলব করবে ?"

"করব ।"

নিখিল জানলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াল। তখন তপতীর মনে নিগূঢ় আশা ফুটল, কিছু একটা অলৌকিক দৃশ্য ওর মাথার পিছনের আলোটা দেখাবে।

"প্রোসেশান করে, ব্যাণ্ড বাজিয়ে হাইকোর্ট থেকে ফিরব। সানাই বসাব পাড়ার মোড়ে। শুধু একটা কথা, তার আগে তুমি মরতে পারবে না, তাহলে সব পণ্ড হয়ে যাবে। তোমার মধ্যে আমি মৃত্যুকামনা দেখতে পেয়েছি। রাত্রে তুমি ঘুমিয়ে পড়ার পর আমি তোমার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনি।"

তপতী কোন দৃশ্য দেখতে পেল না। নিখিলের লম্বা দেহটা দুমড়ে ঝুঁকে পড়েছে। রাস্তার আলো একটা কাঁধে আঘাত করে অন্য কাঁধের দিকে ছিটকে গেছে। তপতীর মনে হল, তীব্র এবং অন্ধের মত নিখিলের মধ্যে একটা ভালবাসা আছে। তার প্রবাহ অনুভব করার জন্য ওর দরকার আঘাত করার মত তটভূমি। ফিরে আসা কল্পনাগুলি পাবার জন্য শক্ত বাঁধ তৈরী করছে প্রবাহের দু' ধারে। কম্পন না পেলেই সন্ত্রস্ত, দিগ্‌ভ্রান্ত হয়। যেন মনে করে, অস্তিত্বই লোপাট হয়ে যাবে।

এই রকম ভালবাসার প্রবাহ আমার মধ্যেও আছে। তপতী মুহ্যমান হয়ে ভাবল. তবে কেন আমি ধ্বংসের হাত থেকে ওকে বাঁচাতে পারছি না। দু'ধারে আটক নেই বলেই কি আমাতে ভালবাসার ধাক্কা লাগে না! ওকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় তবে, আমার মৃত্যু ?

"তুমি কি পারবে আমায় আটকাতে, যদি মরতে চাই ? আমি জানি তুমি পাহারা দিচ্ছ আমায়। কিন্তু যে কোন সময়ই তো আমি মরতে পারি, কাপড়ে আগুন দিয়ে কি ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে। তবু তুমি ছায়ার মত এত রাত্রেও আমার পিছু নিয়ে এ ঘরে এসেছ। আমি এসেছি অসহ্য বোধ করে, শুধুমাত্র আলাদা ঘুমোতে চাই বলে।

রাতের পর রাত আমিও আর জাগতে পারছি না। আমি জানি রাত্রে তুমি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজে বার করতে চাও। তুমি কি ভেবেছ আমি আত্মহত্যা করতে এসেছি?"

"ওরা সিলিং ফ্যানটা খুলে নিয়ে গেছে কিন্তু হুকটা নিয়ে যায়নি। হুকে দড়ি লাগিয়ে—" অধৈর্যে ছটফট করে উঠে নিখিল বলল, "এখন তোমার মরা-টরা চলবে না। তাহলে লোকে দুয়ো দেবে। দশ-বারো-চোদ্দ, যত বছরই লাগুক আমি মামলা লড়ব। জমি আছে আমার, সেটা বিক্রি করেও লড়ব।"

"জমিটা বেচবে?" তপতী বিমূঢ় হয়ে গেল। এই জমিতে দাঁড়িয়েই নিখিল বলেছিল, জমিটা আর তোমাকে যেন এক মনে হল।

"হ্যাঁ, বেচব। জীবনে সুযোগ একবারই আসে। সেই একবার এখন এসেছে।"

"কিসের সুযোগ?"

"নিজেকে প্রমাণ করবার।"

"কি লাভ তাতে?"

"তা হলে সুখী হব। সুখলাভের জন্যই তো জীবন ধারণ।"

"কিন্তু একদিন বলেছিলে এই জমি আর আমি এক।"

"একরকমের দুটি থাকতে পারে না। একটির জন্য অপরটি চলে গেলেই বা ক্ষতি কি? আমার স্ত্রী একটা বাড়ি পাবার লোভে অসতী হয়েছে, তার মানে আমি অক্ষম! এইবার আমি দেখাব আমার ক্ষমতা। ওই বাড়ি দখল করব, তারপর রাস্তার একটা ভিখিরিকে ধরে দান করে দেব। কিন্তু আমি নেবই, সর্বস্ব দিয়েও বাড়িটা নেব। শুধু ভয় তোমাকে, তোমাকে। তুমি শুধু বেঁচে থাক, আর কিছু চাই না। নয়তো মাথা তুলতে পারব না, আমি আর পারব না উঠে দাঁড়াতে।"

অন্ধকারে নিখিলের অবয়ব ভেঙ্গে পড়তে পড়তে একটা ভগ্নস্তূপের আকার পেল। কথা না বলে তপতী ফিরে এল তার ঘরে। বিছানায় চিত হয়ে কপালের উপর আড়াআড়ি দুই হাত রেখে সে ভাবল—

তখন খাটের পাশে পায়চারি করছিল নিখিল—ভোর হওয়ার আগেই বেরিয়ে যাব এই বাড়ি থেকে। মুছে যাব নিখিল আর রুবির কাছ থেকে। আমি না মরলে নিখিল রক্ষা পাবে না। আমায় মরতেই হবে। যেভাবেই হোক, যত অনিচ্ছাই থাক, আমার বাঁচা চলবে না।

"এই তপু, এই এই, স্বপ্ন দেখছিস নাকি! কাঁদছিস কেন?"

ধাক্কা খেয়ে ধড়ফড়িয়ে তপতী উঠে বসল। বাণী স্কুলে যাবার বেশে। বাবলুর পিঠে বইয়ের ব্যাগ। দুজনের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল তপতী।

"আমরা বেরুচ্ছি এখন। তোর ভাত ঢাকা দিয়ে রাখলাম টেবিলে। মনে হচ্ছে এখনো তোর ঘুম দরকার। দরজায় খিল দিয়ে ঘুমো, এ বাড়ির ছেলেমেয়েরা বড্ড চোর। তাহলে চললুম, কেমন, পাঁচটার মধ্যেই আমরা ফিরব।"

ঘাড় নেড়ে তপতী আচ্ছন্নের মত কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর শোয়ামাত্রই ঘুমিয়ে পড়ল। খিল দেওয়ার কথাটুকু পর্যন্ত সে মনে রাখতে পারল না।

বিকেলে রান্নাঘরে চা করতে করতে বাণী বলল, "ব্যাপার কি বল তো? এইভাবে একটা ঝুলি কাঁধে, অত ভোরে কি কেউ কারুর বাড়ি আসে! নিখিলবাবুর সঙ্গে কিছু হয়েছে?"

"হবে আবার কি", তপতী বিষয়টিকে লঘু প্রতিপন্ন করার জন্য ঠোঁটের একটি কোণ মুচড়ে বলল। "সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে এমন সব কাণ্ড করেন যে টেঁকা যায় না। বাড়ি করছেন, কিন্তু তার একতলায় ভাড়াটে বসাবার মত করে প্ল্যান করেছেন। কেন? না, যদি মরে যাই তাহলে তুমি খাবে কি করে! আচ্ছা বাণী তুই বল, এরপর ঝগড়া না করে কোন উপায় আছে? এইসব অমঙ্গলে কথা কোন স্ত্রীর শুনতে ভাল লাগে। আমি বলি—ও প্ল্যান বদলাতে হবে, উনি বলেন বদলাব না। ব্যস, লেগে গেল। আমি বলেছি, যতদিন না ওইসব চিন্তা ছাড়ছ, আমি আর ফিরব না। যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব।"

"বাড়ি করছিস বুঝি, কোথায় ?" বাণী হাসতে হাসতে বলল।

"দমদমার দিকে।"

"এতক্ষণে চারদিকে খোঁজাখুঁজি, থানা পুলিস হাসপাতাল হচ্ছে নিশ্চয়।"

"হচ্ছে না আবার ?...আগেরবার তো কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল।"

"সে কি, আগেও এমন করেছিলি নাকি !"

"না করলে এসব লোককে জব্দ করা যায় না। হঠাৎ একবার বাই উঠল মেয়ের বিয়ে দেবে, পাত্র পর্যন্ত ঠিক। আমি বলি, আগে কলেজে পড়া শেষ করুক তবে তো। কে বোঝায় কাকে। শেষে, এই রকম ভোরবেলায় বেরিয়ে চলে গেলুম হরপুরে বাবার কাছে। এদিকে কাগজে বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন দিয়ে একসা কাণ্ড।"

"তারপর নিজেই ফিরলি তো ?"

তপতী হঠাৎ লাজুক হেসে, ছদ্ম কোপে ভ্রূভঙ্গি করে উঠে দাঁড়াল। "আয়, তোর চুল বেঁধে দি। আগের মতই দেখছি চুল রয়ে গেছে। আমার যা অবস্থা, উঠে উঠে টাক পড়ে গেল।"

ঘরে এসে দুজনে মেঝেয় বসল দরজার দিকে পিঠ ফিরিয়ে। এতক্ষণ ধরে এত অনায়াসে মিথ্যা কথাগুলো বলার পর এখন হালকা বোধ করছে তপতী। মন থেকে পাষাণভারটা কখন যেন সরে গেছে। নিখিল বা অন্যান্য সমস্যা এই মুহূর্তে মনে নেই। অনেক বছর পর সে অনেকগুলো বছর পিছিয়ে যাবার সুযোগ পেয়েছে বাণীকে আশ্রয় করে। চিরুণী দিয়ে বাণীর চুল আঁচড়ে দেবার সময় বালিশে পাওয়া মিষ্টি গন্ধটা আবার পেল তপতী। তাইতে কিশোর বয়সের মত চপল হবার ইচ্ছা ধীরে ধীরে ফুটে উঠল তার মনে। সেই বয়সে অনেকদিন ওর চুল বেঁধে দিয়েছে তপতী। তখন প্রায়ই বলত, তোর এই চুল দেখেই বর জুটবে। বাণী হাসত আর বলত, হ্যাঁ, মেঘবরণ রাজকন্যা তো, তাই কুচবরণ চুল। খোঁড়া রাজকন্যার জন্য একটা কাণা রাজ-পুত্তুর-টুত্তুর জুটলে হয়।

"তোর ধুনি-টাধুনি দেখছি একই রকম রয়েছে। পুরুষরা তাকায় না ?"

তপতীর কথা শুনে হো হো হাসিটাই বাণী নিঃশব্দে হাসল। তপতী ওর চুলে ছোট্ট একটা টান দিয়ে বলল, "হাসছিস যে ?"

"তোর দিকে তাকায় ?"

"দূর, আমার কোমর-টোমর কত বেড়ে গেছে। তোর তো এখনো আইবুড়ো মেয়েদের মতই সব রয়েছে। বেশ আছিস একা একা। এখনো গন্ধ তেল মাখিস।"

"তোর একা থাকতে ইচ্ছে করে বুঝি ?"

"মাঝে মাঝে করে। এক এক সময় ভাবি, বিয়ের আগের মত হয়ে যাই যদি !"

"হলে কি করবি ?"

তপতী চুপ করে রইল। বাণী তাগাদা দিল, "বল, কি করবি ?"

"কি জানি। মেয়ের বয়সই আঠারো হল, এখন কি আর অন্য কিছু ভাবা উচিত, না ভাবা সম্ভব। তুই কি ভাবতে পারিস ?"

"হ্যাঁ।"

"কি কি ?" তপতীর চিরুণী চালনা বন্ধ হয়ে গেল।

"ভালবাসার মত কাউকে পেলে প্রেম করে বিয়ে করব।"

"বিধবা, ছেলেও রয়েছে, তা সত্ত্বেও এই রকম কথা ভাবতে পারিস ?"

"কেন পারব না," অত্যন্ত সহজ একটা অঙ্ক বুঝিয়ে দেবার মত স্বরে বাণী বলল। "স্বামী আমায় ভালবেসেছিলেন কিনা জানি না, তবে আমার মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টির মত কোন কারণ পাইনি। সম্পর্কটা ছিল নেহাতই কর্তব্য পালন। এক বছরের মধ্যে তিনি মারা না গেলে হয়তো খানিকটা মায়া-মমতা গড়ে উঠত, এই পর্যন্ত। কিন্তু ভালবাসার ইচ্ছে তো সব মানুষের মধ্যেই থাকে, কেউ যদি সেই ইচ্ছেটা আমার মধ্যে উসকে দেয়, তাহলে জ্বলব না কেন ? সেই

লোক স্বামী বা অন্য যে কেউই হোক না কেন। এতে দোষের কি আমি বুঝতে পারি না। জ্বলার জন্যই তো জীবন।"

একটানা বলতে বলতে বাণীর চোখ মুখ থেকে উত্তেজনার আভা ঠিকরে বেরোচ্ছে। তপতী শুনতে শুনতে রোমহর্ষক বিস্ময়ের চাপে শ্বাসপ্রশ্বাসে অসুবিধা বোধ করছে। ঘুরে বসল বাণী। থমথম করে উঠল তপতীর বুক।

"কোন মানে হয় জীবনটাকে ভিজে ন্যাতার মত একটা বাসি স্মৃতিতে জড়িয়ে রেখে দিয়ে? শ্বশুর বাড়ির—বাপের বাড়ির লোকেরা আমায় ত্যাগ করেছে। আমার অপরাধ, আমি বিয়ে করব ঠিক করেছি।"

"বিয়ে! তুই আবার বিয়ে করবি!" তপতীর বিস্ময় শিরা-উপশিরার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে তার অনুভূতিগুলিকে কিছুক্ষণের জন্য অসাড় করে ধরে রাখল এবং ছাড়া পাওয়া মাত্র দেখল বাণী দুচোখে ভয় নিয়ে চেয়ে আছে দরজার দিকে।

কি ব্যাপার জানার জন্য তপতী মাথা ঘুরিয়ে পিছনে তাকিয়েই অস্ফুট চাপা চীৎকার করে উঠল এবং কোনরূপ চেষ্টা ছাড়াই, চুম্বক-আকর্ষিত লোহার মত বাধ্য হল উঠে দাঁড়াতে। দাঁড়িয়েই তার মাথা ঘুরে উঠল। ছুটে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেবার কথাই প্রথম মনে এল তার। এগোতে গিয়ে টলে উঠল সে। শরীরটার মধ্যে আবার লোহা ভরে দিয়েছে কেউ যেন। অনড় রয়ে ফ্যালফ্যাল করে তপতী শুধু তাকিয়ে থাকল দরজায় দাঁড়ান মূর্তিটির দিকে।

এরপর তার চেতনা ধীরে ধীরে সক্ষমতা হারাতে শুরু করল। অস্ফুটে সে একবার বলল, "এখানে কি করতে এসেছ?"

উত্তরে শুনল, "তুমিই বা এখানে কেন? সকাল থেকে তাই তোমায় বাড়িতে দেখিনি।"

"বাণী আমার অনেকদিনের বন্ধু।" তপতী কাতর স্বরে বলল।

উত্তরে শুনল, "তাই বুঝি! এইবার আমি বুঝতে পারছি, এইবার ধরতে পারছি নাটের গুরুটি কে! কে আমার সর্বনাশের পেছনে

রয়েছে, কার ষড়যন্ত্রে আজ আমি সর্বস্ব খোয়ালাম।"

"বিশ্বাস করো, ঠাকুরঝি, বিশ্বাস করো, আমি এ সবের কিছুই জানি না।" বায়ুহীন গভীর গহ্বরের তলদেশ থেকে উঠে আসার জন্য তপতী সাহায্য চাইল। উত্তরে শুনল, "নিজে নষ্টচরিত্র, বন্ধুও জুটিয়েছে এক নষ্ট মেয়েমানুষকে। সোনায় সোহাগা! ওকে দিয়েই তুমি ভুলিয়েছ আমার স্বামীকে। কিন্তু এইবার, এইবার আমি আর ছাড়ব না! তোমার কীর্তিকলাপ এবার সবাইকে জানাব।"

"কি বলতে চান আপনি?" বাণী রুখে উঠল। "ক'দিন ধরেই অনেক ব্যাপার অনেক জায়গায় করেছেন। এখন দেখছি বাড়িতে এসেও হাঙ্গামা করতে চান। যা বলার কোর্টে গিয়েই বলুন, পাগলের মত আচরণ করে নিজেকে হাস্যাস্পদ করছেন কেন? এতে কিছু লাভ হবে কি?"

"দরকার নেই আমার লাভের।" ডলি বীভৎস স্বরে চীৎকার করে উঠল।। কুঁজো হয়ে দু হাত মুঠো করে ঠকঠকিয়ে কাঁপছে। ঠেলে বেরিয়ে আসছে দুই চোখ। গলার দু পাশে ফুলে উঠেছে শিরা। ফরসা মুখের পাতলা চামড়া গোলাপী কাগজের মত দেখাচ্ছে। "তোমাদের পরিচয় আমি আজ সবাইকে দিয়ে যাব। হ্যাঁ, পাগলই হবো আমি। কিন্তু তোরাও রেহাই পাবি না। তোদের ছেলে-মেয়েরাও রেহাই পাবে না। আমার যেমন সর্বনাশ করেছিস, তোদেরও করব।"

তপতী আর কিছু শুনতে পেল না। বাণী ছুটে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে। সেই সময়টুকুর মধ্যে শুধু বাবলুর আতঙ্কিত কচি মুখটা সে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়ির বাসিন্দাদের মধ্যে দেখতে পেয়েছিল। আচ্ছন্নের মত তপতী আয়নার দিকে মুখ ফিরিয়ে খাটে বসল। আয়নায় সে একদৃষ্টে নিজের দিকে তাকিয়ে রইল। ঘরের বাইরে থেকে একটা তীক্ষ্ণ উন্মত্ত স্বর কানে এসে বাজছে। ঘরে ছটফটিয়ে পায়চারি করছে বাণী। আয়নায় ইতিমধ্যে তপতী ধীরে ধীরে নিজেকে আবছা হতে দেখল। একবার নিখিলকেও

দেখল রাস্তায় উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে, পিঠের উপর একটা পা। ওঠার চেষ্টা করতেই পায়ের চাপে আবার নেমে গেল পিঠটা।

তপতী চোখ বন্ধ করল এবং নিঃসাড়ে ঢলে পড়ল বিছানায়।

যখন সাড় ফিরল, একটি পুরুষ কণ্ঠস্বর তার কানে এল। একটু-খানি চোখ খুলে তপতী সাদা দেয়াল ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না। তারপর মনে হল, তাকে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। মাথার নীচে দুটি বালিশ।

"এইভাবেই শুয়ে থাকুক। যদি না ওঠে তো আর তুলো না।" পুরুষকণ্ঠ বলল।

"কাল সকালে কি হবে?" বাণীর কণ্ঠ চাপা এবং উদ্বিগ্ন।

কিছুক্ষণ কথা নেই। তপতী চোখ বন্ধ করে অপেক্ষায় রইল। পুরুষকণ্ঠটি তার পরিচিত মনে হচ্ছে। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে দেখার মত সাহস আর নেই। ইতিমধ্যে কি ঘটে গেছে না জানা পর্যন্ত এইভাবেই শুয়ে থাকার কথা সে ভাবল।

"এখানে আর আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়," বাণীর কণ্ঠ, কিন্তু বিষাদগ্রস্ত। "এ বাড়ির লোকেরাও আর থাকতে দেবে না। দেখলে না পাশের ঘরের বিমলবাবুও কেমন হঠাৎ ক্ষেপে উঠল। তাছাড়া চিন্তা আমার বাবলুর জন্য। যা দেখল বা শুনল, এতে ওর মনে কি যে প্রতিক্রিয়া হবে, এখন আমার সেই ভয়। তুমি এসে পড়লে তাই, নয়তো ও আরো কি শুনাত কে জানে!"

"এতটা হতো না যদি বৌদি না আসত।" পুরুষকণ্ঠ এবং বিরক্ত স্বর এইবার তপতীকে চিনিয়ে দিল। ব্রজেন যাকে বিয়ে করবে বলেছিল সে তাহলে বাণী! তপতী ভাবল, কোনক্রমেও ওদের সম্পর্কটা যদি আগে জানতুম, এখানে আসতুম না।

"তপু আগাগোড়া আমায় মিথ্যে বলল কেন যে!"

"কে জানে, হয়তো সত্যিই ওইভাবে বাড়িটা পেয়েছে। অত টাকার বাড়ি, লোভ হয়তো সামলাতে পারেনি। চেহারা দেখে মানুষ বোঝা বড় শক্ত।"

"কালকেই ওকে বলব, অন্য কোথাও যাক্। যা হবার তা তো হয়েই গেছে, এবার ওর স্বামী এসে না চীৎকার শুরু করে। বাড়ির লোক, পাড়ার লোক, সবাইয়ের কাছে কি করে মুখ দেখাব ভেবে পাচ্ছি না।"

"চেঁচামেচি করে তোমায় অপদস্থ করার জন্যই এসেছিল, কিন্তু বৌদিকে দেখেই বোধহয় এত বেশি নোংরা কথা বলল। ওদের পাড়াতেও যে এত ব্যাপার ঘটে গেছে কে জানত!"

"কাল কিভাবে ওকে যে চলে যেতে বলব।"

তোকে কিছু বলতে হবে না, একটা কথাও না। বাণী, এই নিয়ে আর দুর্ভাবনা করতে হবে না তোকে। আমি ভোরবেলায়ই চলে যাব। কেউ দেখতে পাবে না, তুই পর্যন্ত জানতে পারবি না। শুধু দয়া করে এখন তোরা আমার দিকে আর তাকিয়ে থাকিস না। আলোটা নিভিয়ে দে। অন্ধকারে আমি ঢেকে যাই। এখন থেকে আমি নিজেকে সঁপে দিচ্ছি আমার নিয়তির হাতে। সে আমায় যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাব। আমি জেনে গেছি, আর উপায় নেই আমার নিয়তিকে ফাঁকি দেওয়ার। আর কিছু করার নেই আমার। অন্ধকার করে দে, আমায় সে গ্রাস করুক। কথাগুলো মনে মনে বলতে বলতে, তপতীর চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

॥ এগারো ॥

"হরপুর এসে গেছে মা।"

তপতী অন্যমনস্কের মত বাসকণ্ডাক্টরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তাইতে কণ্ডাক্টর আবার বলল, "হরপুরের ঘোষপাড়ায় যাবেন তো, এখানেই নামতে হবে।"

তপতী ঘাড় নেড়ে ব্যস্ত হয়ে নেমে পড়ল। আর কেউ নামল না। বাসটি কিছু দূরে এগিয়ে যাবার পর চারধারে তাকিয়ে তার

মনে হল, আর বোধহয় ফিরে যাওয়া যাবে না। কেউ তাকে ফিরিয়ে নিতে আসবে না। দু'ধারে বিস্তৃত ধান খেত গাছপালা, একটি খাল প্রখর সূর্যালোক আর ঝিরঝিরে বাতাস প্রভৃতির রূপ ও অনুভবের মাঝে তপতীর মন কেঁদে উঠল কলকাতায় তার সংসার স্বামী ও কন্যার জন্য। নির্জন সড়কের উপর দাঁড়িয়ে সে চোখের জল মুছল।

তিনটি শিশু বই বগলে স্কুলে চলেছে। তপতী চারধারে তাকিয়ে লোকালয় দেখতে পেল না। কিছুদিন আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। ঘাস আর গাছের পাতা ঝকঝকে, সতেজ। মাঠে মাঠে সদ্য রোয়া ধান-চারার গলা সমান জল। পল্লীগ্রাম সম্পর্কে তপতীর কোন ধারণা নেই, কখনো সে আসেওনি। গল্প-উপন্যাস আর সিনেমা থেকে যতটুকু জানতে পারা যায় ততটুকুই জানে। শিশু তিনটি কাছে আসতে সে একজনকে জিজ্ঞাসা করল ঘোষপাড়া কোন দিকে? সে খালের ধার দিয়ে চলে যাওয়া উঁচু বাঁধটা দেখিয়ে বলল, "সোজা এই পথে।"

তপতী বাঁধ ধরে হাঁটতে শুরু করল। মাঝে মাঝে একতলা জীর্ণ পাকা বাড়ি, কিছু খড়ের চালার কুটির, তাতে কর্মব্যস্ত নারী এবং শিশু ইত্যাদি তার চোখে পড়ল। কলকাতায় এই সময় নিখিল অফিসে বেরিয়ে গেছে, রুবি কলেজ থেকে ফিরেছে। এই কথা মনে পড়তেই বিষণ্ণ হয়ে এল তপতী। হাঁটার গতি মন্থর হয়ে পড়ল। মাঝে মাঝে, পথিকরা পাশ দিয়ে যাবার সময় কৌতূহলে তার মুখের দিকে তাকাল।

মিনিট পনেরো-কুড়ি হাঁটার পর তপতীর মনে হল, এবার কাউকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। বাঁদিকে একটা সরু পথ চলে গেছে। তার মনে হল সেদিকে গ্রাম আছে। কিন্তু এ পথে যাবে কিনা ভেবে ইতস্তত করছে, তখন সাইকেলে চড়ে একজনকে আসতে দেখল। একটি স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে সাইকেল-আরোহী গতি মন্থর করল।

তপতী বলল, "সরোজবরণ ঘোষের বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন ?"

সাইকেল থেকে নেমে লোকটি বিব্রতভাবে তাকিয়ে বলল, "কোন গ্রামে থাকেন ? হরপুরেই ?"

"হ্যাঁ, হরপুরের ঘোষপাড়া।"

লোকটি এবার কিছুক্ষণ চিন্তা করল আপন মনে। ঘাড় নাড়ল, এবং চারধারে তাকাল নিরুপায়ের মত। তাইতে তপতীর উৎকণ্ঠা আরো বেড়ে গেল। তার মনে হল, কোনরকম খবর না রেখে শুধু নামটুকু সম্বল করে এমন জায়গায় হঠাৎ এসে পড়া উচিত হয়নি। এত বছরে অনেককিছুই ঘটে যেতে পারে। হয়তো এখান থেকে চলে গেছেন কিংবা মারাও যেতে পারেন। কিন্তু মারা গেলে সে নিশ্চয় খবর পেত। একমাত্র মেয়ে বাবার মৃত্যুর খবর পাবে না, এমন ব্যাপার হতেই পারে না।

"এ নামে কেউ আছে বলে তো মনে হয় না। আচ্ছা তিনি কি করেন ?"

"কি করেন এখন, তা তো বলতে পারব না, তবে বহুকাল আগে ঝরিয়ায় কয়লাখনিতে চাকরী করতেন। এখন বয়স হবে প্রায়—" তপতী হিসাব শুরু করল। মামার কাছে একবার শুনেছিল একটু বেশি বয়সেই বাবা বিয়ে করেন। মার সঙ্গে বয়সের ব্যবধান ছিল প্রায় কুড়ি বছরের। নীলিমার বিয়ে হয় আঠারো-উনিশে। তখন সরোজবরণ ছিলেন আটত্রিশ-উনচল্লিশ। তপতীর বয়সই এখন আটত্রিশ। নিজের বয়স যোগ দিয়ে সে বলল, "প্রায় পঁচাত্তর-ছিয়াত্তর হবে।"

লোকটি আবার চিন্তিত হল এবং অনুমান-নির্ভরস্বরে বলল, "এই বয়সের একজন আছেন বটে, বটুবাবু বলেই তাঁকে জানি। নিজের বাড়ির দোতলায় থাকেন, কেউ তাঁকে কখনো একতলায় নামতে দেখেনি। তিনকুলে এক মেয়ে ছাড়া আর নাকি কেউ নেই।"

রুদ্ধশ্বাসে তপতী বলল, "কোথায় তাঁর বাড়িটা ?"

লোকটি এবার বিস্মিত হয়ে বলল, "এঁকেই খুঁজছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"আরো খানিকটা গিয়ে বিরাট এক বুড়ো অশ্বত্থ গাছ দেখবেন, তার পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা বাঁদিকে চলে গেছে সেইটা ধরে গেলেই ঘোষপাড়া। ওখানে দোতলা বাড়ি একটাই, দেখলেই চিনতে পারবেন।"

লোকটার কথা শেষ হওয়ামাত্র তপতী হাঁটতে শুরু করল। অশ্বত্থ গাছটাকে চিনতে পারল। তার পাশের রাস্তা ধরে এগোতেই গ্রামের আভাস পেল। অল্প কয়েকটা মাটির বাড়ি, টিউবওয়েল, রাস্তার ধারে খোঁটায় বাঁধা গরু এবং কিছু মানুষ দেখে তপতী ভরসা পেল। ওরা অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে। চাষীগোছের একজনকে সে জিজ্ঞাসা করল, "বটুবাবুর বাড়ি কোনদিকে ?"

নির্দেশ দেবার আগে লোকটি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়েছিল। ওর নির্দেশমত একটু এগিয়ে রাস্তাটা ঘুরতেই তপতী দেখতে পেল বাড়িটা। চৌকো একটা বাড়ি, দেড় মানুষ সমান উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। দোতলায় দক্ষিণে টানা বারান্দা। বড় বড় আটটা জানলা বাড়ির পশ্চিমে। সবগুলো বন্ধ। দেয়ালে শ্যাওলা ধরেছে, কার্নিশে ঝোপ হয়ে আছে। একটা বটগাছ দোতলার ঘরের ছাদ থেকে ঝুরি নামিয়ে দিয়েছে একতলা পর্যন্ত। ছাদ থেকে প্রায় এক হাত বেরিয়ে থাকা পোড়া মাটির বৃষ্টিজলের নল-গুলোর দুটিমাত্র অটুট রয়েছে। বারান্দার লোহার রেলিং-এর হাত পাঁচেক ভাঙা, সেখানে গুণচিহ্নের মত আড়াআড়ি করে দুটো বাঁশ রাখা। দূর থেকে দেখে তপতীর মনে হল, এ বাড়ির দেহে প্রাণের স্পর্শ নেই। মৃতদেহের অভিমানে শীতল হয়ে আছে এর অঙ্গ। জীবনকর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ার লক্ষণগুলি, ক্ষয়প্রাপ্ত প্রতিটি ইঁটে, কাঠে, লোহায় প্রকট।

দু'মানুষ উঁচু পাঁচিলের দরজাটি ভিতর থেকে বন্ধ। তার গোড়ায়

গজানো ঘাসের উচ্চতা দেখে তপতী বুঝল এটি বহু বছর খোলা হয় না। পাঁচিল ধরে এগিয়ে সে ক্ষুদ্র আর একটি দরজা দেখল। ইতস্তত করে সে দু ধারে তাকাল, যদি কারুর সাক্ষাৎ মেলে। চারদিকে বড় বড় নানান ফলের গাছ এবং দূরে কয়েকটি মাটির গৃহ ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না। কয়েকটি শালিকের কর্কশ ঝগড়া ছাড়া কোনরূপ শব্দও সে শুনতে পাচ্ছে না। একমাত্র সূর্যই অবিরাম রৌদ্র ঢেলে স্থানটিতে কিছুটা উত্তাপের সঞ্চার করেছে। তপতী দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল।

দোতলার বারান্দার নীচেই টানা রক। ঘরের দরজাগুলি বন্ধ। বিস্তৃত আঙিনাটি লম্বা ঘাসে ভরা। তার মধ্য দিয়ে পায়ে-চলা সরু পথটি জানিয়ে দিল, এখানে মানুষের যাতায়াত হয়। পাঁচিলের একধারে টিউবওয়েল। তার চারপাশের ভূমি সিক্ত, লক্ষ্য করে আশ্বস্ত হল তপতী। গলা খাঁকারি দিল সে। তারপর রকের উপর উঠল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মৃদুস্বরে ডাকল, "কেউ আছেন?"

কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। সে অপেক্ষা করে রইল। সারা বাড়িতে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। রৌদ্রের আঘাতে বৃষ্টি-ভেজা ঘাসের আঙিনা থেকে তাপ উঠছে। তপতীর উত্তেজিত স্নায়ু প্রখর হয়ে উঠল।

"কে আপনি, কাকে খুঁজছেন?"

তপতী চমকে ঘুরে দাঁড়াল। কাউকে দেখতে পেল না। প্রশ্নটি হয়েছে গম্ভীর পুরুষকণ্ঠে। তার মনে হল তাকে লক্ষ্য করা হচ্ছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম নিয়ে তপতী দোতলায় ওঠার সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়াল। ওপর থেকেই যেন প্রশ্নটা এসেছে বলে তার মনে হচ্ছে।

"কাকে চাই?"

তপতীর মনে হল, এই স্যাঁতস্যাঁতে প্রায়ান্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে তাকে প্রশ্নকারীর সামনে দাঁড়াতে হবে। মুখ তুলে

সে অনিশ্চিত স্বরে বলল, "সরোজবরণ ঘোষকে খুঁজছি আমি।"

আবার নিস্তব্ধতা। কিন্তু এবার সে প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। নিজের কণ্ঠস্বরের অনুরণনে দেহের মধ্যে বিস্ময় সঞ্চারিত হওয়ায় ভরসা পাচ্ছে তপতী।

"আপনার নাম? প্রয়োজন?"

"আমার নাম তপতী, আমি সরোজবরণ ঘোষের মেয়ে।" তপতী প্রয়োজনের কথাটা বলতে গিয়ে ভেবে পেল না কি বলবে!

"ওপরে এসো।"

তপতী সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাউকে দেখতে পেল না। ডানদিকে না বাঁদিকে যাবে, স্থির করতে না পেরে সে পশ্চিমদিকে এগিয়ে গেল। পরপর তিনটি ঘরের দরজাই বন্ধ। ঘুরে দাঁড়িয়ে বারান্দার অপর প্রান্তে তাকাতেই বুকের মধ্যে থর থর করে উঠল তার। বারান্দার সীমানার বাইরেই রৌদ্রের প্রবল প্রবাহে ভেসে যাচ্ছে দিগন্তের নীল, ঝলমল করছে গাছের সবুজ। চোখ ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্যে শূন্যতা পরিব্যাপ্ত। আর তারই মাঝখানে বারান্দার কিনারে দাঁড়িয়ে ঘোর কৃষ্ণকায় দীর্ঘদেহী এক পুরুষ। পরনে সাদা ধুতি মাত্র। এককালে যে শক্তিধর ছিলেন, চোপসান পেশীগুলো তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। মাথার চুল ঘন-কুঞ্চিত, ধূসর-সাদা। নাকটি চাপা, ঠোঁট দুটি পুরু, চোয়াল চওড়া। ঘনভুরুর নীচে চোখদুটি কোটরে ঢোকা। বুকে এবং হাতে ঘন লোম। দেহের কোথাও মেদের চিহ্নমাত্র নেই।

দেখতে দেখতে তপতীর মনে হল, কঠিন এক প্রস্তরখণ্ডের সামনে সে দাঁড়িয়ে। এর মধ্য থেকে কর্কশতা বিকীর্ণ হচ্ছে। এই প্রস্তরে প্রাগৈতিহাসিক চেতনার ছোপ লেগে আছে। নিঃসঙ্গতা একে নিষ্ঠুর সৌন্দর্য দান করেছে এবং একে স্পর্শ করলেই দেহের অভ্যন্তর অন্ধকার হয়ে যাবে।

"কি জন্য এসেছ?"

দ্বিধা না করে, স্পষ্ট স্বরে তপতী বলল, "থাকতে এসেছি।"

শোনামাত্র ভ্রূকুঞ্চিত হল সরোজবরণের। কিন্তু, দাঁড়াবার ভঙ্গিতে বা কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন না ঘটিয়ে বলল, "কতদিন থাকবে?"

প্রথমেই এই ধরনের প্রশ্নে তপতী অপ্রতিভ বোধ করেও লক্ষ্য করল, এই বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর প্রগাঢ় যুবকের মত ভরাট ও লঘু। ঈষৎ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে তপতী উত্তর দিল, "কিছু ঠিক করে আসিনি; যতদিন ভাল লাগবে, থাকব।"

সরোজবরণ কয়েকমূহূর্ত তপতীর মুখের উপর দৃষ্টি রাখল। তখন তপতীর মনে হল, তার অভ্যন্তর এই দৃষ্টি দ্বারা এখনি উন্মোচিত হয়ে যাবে। চোখ সরিয়ে নিয়ে, নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বৃদ্ধ অস্ফুটে বলল, "আচ্ছা।"

তপতী দেখল ওর পিঠ বাঁকা, গমনভঙ্গি বেড়ালের মত সতর্ক ও নিঃশব্দ। বারান্দায় একা দাঁড়িয়ে সে তারপর ভাবল, এবার কি হবে! এখানে থাকার ঠাঁই না পেলে আর কোথায় যাব? কোথাও যাবার জায়গা নেই। তাহলে কি নিখিলের কাছেই ফিরে যেতে হবে? ঝিরঝিরে বাতাসে নারকোল গাছের পাতা অল্প অল্প কাঁপছে। আকাশে ডানা ছড়িয়ে বিন্দু বিন্দু চিল ভাসছে। গাছের ছায়ায় বসে মহিষ জাবর কেটে চলেছে। দূরে কয়েকটি পথ-চলতি মানুষ মাথায় মোট নিয়ে গাছের আড়ালে মিলিয়ে গেল। বিলম্বিত দীর্ঘ সুরে গরু ডাকছে।

আলস্য আর আলস্য চতুর্দিকে। অচঞ্চল, ধীর এই পরিবেশে তপতী ক্রমশ শিথিল হতে শুরু করল। দেহের প্রতিটি কোষে এই আলস্য ভরে নিতে সে বারান্দার রেলিংয়ে শরীর হেলিয়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। দু'চোখ ডুবে যাচ্ছে দিগন্তে, নৈঃশব্দ্য প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তার বুকের মধ্যে। নির্জনতা রোমকূপের মধ্য দিয়ে চুঁইয়ে ছেয়ে যাচ্ছে শরীরে। ভাল লাগছে তপতীর। এইভাবে কোনদিনই সে নিঃসঙ্গতা উপভোগ করেনি। শুধু-ই দুঃখের বা সুখের জন্য এতকাল ব্যতিব্যস্ত থেকেছে। এখন তার মনে হচ্ছে, সবই অকারণে।

"রেলিঙয়ে হেলান দিয়েছ কেন, ভেঙে পড়তে পারে।"

তপতী চমকে উঠে সিধে হয়ে দাঁড়াল। সরোজবরণ আবার ঘরের বাইরে এসেছেন। হাতে চাবির গোছা। অব্যবহারে চাবিগুলোর রঙ মরচে ধরে দারুচিনির মত। বারান্দার পশ্চিম প্রান্তের বন্ধ ঘরের তালা খুলে সরোজবরণ বললেন, "এই ঘরে থাকবে।"

তপতী এগিয়ে এসে ঘরের ভিতর তাকাল, জানলাগুলো বন্ধ থাকায় বোঝা যাচ্ছে না ঘরের মধ্যে কি আছে। সরোজবরণ ইতস্তত করে বললেন, "জানলা খুলতে পারবে তুমি? অন্ধকারে আমি ভাল ঠাওর করতে পারি না।"

তপতী ঘরে পা দিয়েই নিঃশ্বাস বন্ধ করল। ভ্যাপসা এবং স্যাঁতসেতে গন্ধে শিরশির করে উঠল ত্বক। বছরের পর বছর ঘৃণা, অবহেলা এবং নিষ্ঠুরতা দ্বারা প্রত্যাখ্যানের অনুভব পেল তার শরীরে।

"ডানদিকে পালঙ্কটা, বাঁদিকে আলমারি। আলমারির গায়ে একটা জানলা, আগে ওটা খোল।"

সামনে হাত বাড়িয়ে, পা ঘষে ঘষে তপতী এগোল। বাঁদিকে ঘুরে আঙুলে কাঠের ছোঁয়া পেল। তার পাশে শূন্য দেয়াল। তারপর জানলা। কিছুক্ষণ টানাটানির পর সে জানলা খুলতে পারল।

সারা ঘর বিবর্ণতায় ছাওয়া। বিরাট পালঙ্কের উপরে মশারিটা টাঙানো, মসৃণভাবে বিছানায় চাদর পাতা। একধারে চারটি বালিশ সাজিয়ে রাখা, তার ওয়াড়ে লতাপাতার নক্সা। বিছানার আর একধারে শিশুর মাপের একটি তোষক, একটি ছোট বালিশ, দুটি পাশ-বালিশ আর কয়েকটি কাঁথা। যদি না এর প্রত্যেকটির রঙ বাসি শবদেহের ওষ্ঠের মত হতো, তাহলে আজও ব্যবহৃত হয়েছে অনুমান করা চলে। দেয়ালে দীর্ঘ একটি আয়না। স্থানে স্থানে পারা উঠে কালো দাগ ধরে রয়েছে। তার নীচের তাকটিতে কয়েকটি কৌটো, শিশি এবং চিরুনী। একটি চেয়ার উল্টোমুখে

দেয়ালের দিকে ফেরান। আলনায় পরিপাটি করে কুঁচিয়ে রাখা রঙীন আটপৌরে শাড়ি ব্লাউজের সঙ্গে শিশুর কয়েকটি জামাও রয়েছে। কাঠের পাল্লার বিরাট আলমারি ও দেয়ালে দুটি অর্ধনগ্ন বিদেশিনীর রঙীন ছবি ছাড়া তপতী আর কোন আসবাব দেখতে পেল না।

কৌতূহল চাপতে না পেরে সে জিজ্ঞাসা করল, "ঘরটা এইভাবে রাখা কেন?"

সরোজবরণ প্রশ্নটির জবাবে বললেন, "তুমি এই ঘরে থাকবে।"

"কে থাকত এ ঘরে?"

"তোমার মা। এ ঘরে যা কিছু দেখছ সবই তার।" সরোজবরণ চোয়াল শক্ত করে ঘরের চারদিকে চোখ বোলালেন। "ঠিক সেইভাবেই রাখা আছে। তুমি ইচ্ছে করলে ব্যবহার করতে পার।"

সরোজবরণ কথা শেষ করেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তপতী দাঁড়িয়ে থাকল ঘরের মাঝে। এই ঘরে থাকতে হবে, এই পালঙ্কে শুতে হবে ভেবে ছমছম করে উঠল তার বুক। আয়নার কাছে গিয়ে সে একটা কৌটো তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। জং ধরে গেছে। তার মনে হল এটি পাউডারের কৌটো। চেষ্টা করেও ঢাকনাটা খুলতে পারল না। শিশিতে গাঢ় কালো তরল পদার্থ, মাথার তেল হয়তো। সিঁদুর কৌটোর ঢাকনাটা আলগা। ধুলোর মত দেখাচ্ছে সিঁদুর। আশ্চর্য হল, চিরুনীতে এখনও কয়েকটা চুল লেগে আছে দেখে। হাত দিতেই ধুলোর মত ঝরে পড়ল। আলনা থেকে একটা ফ্রক তুলে নিল তপতী। এটা তারই, ভেবে, কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে রইল, তারপর হাসি ফুটল। ফ্রকটা জিরজিরে, ছাতা ধরে কালো হয়ে গেছে, রঙ বোঝা যায় না। হাতে নিয়ে তপতী নিজের শৈশবকে অনুমানের চেষ্টা করল। হরপুরকে কোনভাবেই কল্পনা করতে পারল না। নিজের মাকেও নয়। মায়ের কোন ছবিও সে দেখেনি। শুধু শুনেছে, তার এক বছর বয়সে মা পুকুরে

ডুবে মারা যায়। দিদিমা বলত, নীলুকে খুন করে পুকুরে ফেলে দিয়েছিল। সরোজবরণই নাকি খুনী।

তপতী সন্তর্পণে দরজার কাছে এসে বারান্দায় তাকাল। রেলিংয়ের উপর আলতোভাবে হাত রেখে সরোজবরণ নির্নিমেষে দূরের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছেন। দাঁড়াবার ভঙ্গিতে বহু বছরের জমানো ক্লান্তি, চোখে বহু বছরের নিঃসঙ্গতা। দেখে মায়া হল তপতীর। হঠৎ সে দেখল, সরোজবরণের চোখে ধীরে ধীরে প্রচণ্ড ক্রোধ ফুটে উঠছে, চাহনিতে তীব্র আক্রোশ। মুষ্টি বদ্ধ হল, দেহ ঈষৎ নুয়ে ঠকঠক করে কেঁপে কঠিন হয়ে রইল। বিড়বিড় করে তিনি প্রবল শাসানি দিলেন যেন কাউকে। ওর দেহের অভ্যন্তরে এখন যেন প্রচণ্ড এক পাশব ইচ্ছা তোলপাড় করছে।

প্রায় দু'মিনিট এইভাবে থেকে সরোজবরণ আবার ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে গেলেন। মুখ ফিরিয়ে তিনি তপতীকে কৌতূহলে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে, রুক্ষস্বরে বললেন, "কি দেখছ এভাবে? এখানে থাকতে হলে লুকিয়ে আমার দিকে তাকান চলবে না।"

আঙুলগুলোকে লোহার বাঁকানো হুকের মত রেলিংয়ে আটকে সরোজবরণ ঝাঁকানি দিলেন। গোটা বারান্দাটাই যেন কেঁপে উঠল। বৃদ্ধ বয়সেও দেহে এত জোর থাকতে পারে! তপতী বুঝে উঠতে পারছে না, মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, দোতলার একটি ঘরে বছরের পর বছর এই প্রায় পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছে কেন? কিসের জন্য? একটু আগেই ওর যে মূর্তি সে দেখেছে, তাতে মনে হল, প্রবল জ্বালায় জ্বলছে। সেটা নেভাবার কোন চেষ্টা করছে কিনা কে জানে! ওর ব্যবহারে বা আচরণের মধ্যে বয়সোচিত গুণাবলী স্পষ্ট নয়। ক্ষমার স্পর্শ ওর ললাটে লাগেনি, ত্যাগ এড়িয়ে গেছে ওষ্ঠপ্রান্ত, চোয়ালে কারুণ্যের কঠিন প্রত্যাখ্যান। দেহের ভঙ্গিতে ক্রোধের চাপা গতিবিধি। তপতীর মনে হল প্রাগৈতিহাসিক এক যুবককে সে দেখছে।

"তুমি খেয়ে এসেছ তো ?"

"হ্যাঁ।" বলার পরই তপতীর মনে পড়ল কাল বাণী তার জন্য ভাত রেখে স্কুলে চলে যায়, সেই ভাত খাওয়া হয়নি। রাত্রেও কিছু খায়নি সে। আজ এই পর্যন্তও কিছু পেটে পড়েনি। অথচ সে বিন্দুমাত্রও ক্ষুধা বোধ করছে না।

"একটা মেয়েছেলে এসে আমার কাজটাজ করে দেয়। রান্নাও করে। বিকেলে আবার আসবে। তাকে দিয়ে ঘরটা পরিষ্কার করে নিও। তুমি কতদিন থাকবে ঠিক করে বলো।"

"জানি না।"

"এসেছ কি জন্য ?"

"আপনাকে দেখব বলে।"

"হঠাৎ দেখার ইচ্ছে হল যে! বুড়ো হয়েছি, শিগগিরী মরে যাব, তাই সম্পত্তির লোভে সেবা-যত্ন করতে এসেছ? কিন্তু জান কি. আমার এই বাড়িটা ছাড়া সব সম্পত্তি দান করে দিয়েছি!"

শোনামাত্র আগুন জ্বলে উঠল তপতীর মাথার মধ্যে। সামলে ওঠার জন্য দৃষ্টি আনত করল এবং কয়েক সেকেণ্ড পরই ঝাঁকুনি দিয়ে মাথা তুলে কর্কশ কণ্ঠে বলল, "আপনার সম্পত্তি আছে কি নেই, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমি থাকতে এসেছি আমার বাপের বাড়িতে। সে অধিকার আমার আছে।"

"কি করে সে অধিকার পেলে ?"

"না, সে সুযোগ কখনো পাইনি। কোনদিনই আমাকে কাছে আসতে দেননি। আমি আজই প্রথম আমার বাবাকে দেখছি।"

শোনা মাত্র সরোজবরণের চোখের কোণের চামড়া কুঞ্চিত হল, চোখ দুটি সরু হয়ে এল, তীক্ষ্ম নজরে তপতীকে দেখার চেষ্টায় এবং ব্যঙ্গের হাসি ধীরে ধীরে মুখটাকে দোমড়াতে শুরু করল। তপতী এই আক্রমণের বিরুদ্ধে দিশাহারার মত কথাগুলো ছুঁড়ল—"

"জন্মসূত্রেও কি এখানে আসার অধিকার আমার নেই ?"

"জন্মসূত্রে! তুমি প্রমাণ করতে পারবে? এই দেখ আমার

গায়ের রঙ, চোখ-নাক-ঠোঁট-চুল-মাথার গড়ন। এই দেখ, গায়ের লোম। আগাগোড়া একটা বনমানুষের মত। পার আমাকে তোমার বাবা বলে বিশ্বাস করতে? তোমার ওই গায়ের রঙ, ওই চোখ, ওই নাক, ওই ঠোঁট একে একে আমার ওপর বসিয়ে মানিয়ে মিলিয়ে নিতে পার?"

"শুনেছি আমি নাকি হুবহু মায়ের মত দেখতে। আমার মেয়েও হুবহু আমার মতই দেখতে।"

সরোজবরণ আর কথা না বলে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। তপতীর মনে হল, এত অমার্জিত ভঙ্গিতে ওঁর ঘুরে দাঁড়ানোর ফলে চতুষ্পার্শ্বের নৈঃশব্দ্য নিশ্চয় আহত হয়েছে। কোমল দৃষ্টি মেলে সে দূরের আকাশে তাকিয়ে রইল।

॥ বারো ॥

বীণা নামে কিষাণ বৌটি সন্ধ্যার আগেই কাজ সেরে চলে গেছে। তাকে দিয়ে তপতী ঘরের ধুলো পরিষ্কার করিয়েছে, মেঝে ধুইয়েছে। রাত্রে সরোজবরণ দুধ-চিঁড়ে ছাড়া আর কিছু খান না। তপতীও তাই খেয়েছে। সারা বাড়িতে একটি হারিকেন জ্বলে। আর একটি আছে, কিন্তু তার চিমনিটি ভাঙা। বীণা কাল এনে দেবে গ্রামের মুদীর দোকান থেকে। কাল সকালে সে ভাত করে তপতীকে খাওয়াবে। যাওয়ার সময় সে অবাক চোখে ভীত স্বরে বলেছিল, "দিদিমণি, রাতে তুমি থাকতে পারবে এবাড়িতে?" তপতী হেসে লঘুস্বরে বলেছিল, "কেমন পারব না। এটা তো আমার বাপের বাড়ি।"

বীণা একটা মোমবাতি রান্নাঘর থেকে এনে দিয়ে গেছে। সরোজবরণের ঘর থেকে ওকে একটা বিছানার চাদর আনতে পাঠিয়েছিল। ফিরে এসে বীণা বলে, "চুপ করে শুয়ে আছে। এখন

কথা বললে ভীষণ রেগে যাবে। এইভাবে হয়তো টানা তিন-চারদিন শুয়ে থাকবে, তখন কথা বলা বারণ। ওনার হাঁপানির রোগ আছে তো। বাইরের লোকজনকে ওপরে উঠতে দেয় না। আজ এগারো বছর আছি, একদিনও নীচে নামতে দেখিনি। জল তুলে দি, ওপরেই চান-টান সারে। দোকান-বাজার তো সামান্যই হয়, আমি করি কিংবা আমার স্বামী করে। বাইরে কোথায় যেন কাজ করত, ছেড়ে দিয়ে এইভাবে পনেরো-বিশ বছর রয়েছে। ভাবলে অবাক লাগে, মানুষ পারে কি করে!"

নতুন মানুষ পেয়ে বীণা অজস্র কথা বলেছিল। পালঙ্কে পাতা তোষক, চাদর ও বালিশগুলো একধারে সরিয়ে নিজের একটি শাড়ি ছোবড়ার গদির উপর বিছিয়ে এবং ঝুলিটাকে বালিশ করে মাথায় দিয়ে শুয়ে তপতী সেই কথাগুলোই ভাবতে লাগল। দীর্ঘদিনের জমে থাকা বাসি ভ্যাপসা গন্ধ উঠে আসছে গদি থেকে। খোলা দরজা দিয়ে বারান্দার রেলিংয়ে মোমবাতির আলো পড়েছে। হাওয়ায় শিখাটা কেঁপে উঠলে মনে হয় রেলিংটা নাড়াচ্ছে কেউ। গুটিয়ে রাখা মশারির চালটা ঝুলে রয়েছে ঠিক মাথার উপরেই। ঘরের প্রত্যেকটি জিনিসের বয়স আমার থেকেও বেশি, এই কথা ভেবে চারধারে আবার চোখ বুলিয়ে তপতীর মনে হল, একটা প্রাচীন সামগ্রীর সংগ্রহশালার মধ্যে সে শুয়ে রয়েছে। এবং একদিন সে নিজেই এই ঘরের একটি সামগ্রীতে পরিণত হবে। একথা মনে হওয়া মাত্রই তাকে আচ্ছন্ন করতে লাগল মৃত্যু-ভয়। সে চোখ বন্ধ করল। তার মনে হতে লাগল, কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে পালঙ্কের পাশে, থমকে তার মুখের দিকে তাকাচ্ছে এবং তার দিকে এগিয়ে আসছে। দুহাতে মুখ ঢেকে ঠকঠক করে সে কাঁপতে শুরু করল। চোখ খোলার সাহস হচ্ছে না।

এইভাবে থাকতে থাকতে ঝিমিয়ে পড়ল তপতী। মোমবাতিটা নিভে গেল নিঃশেষ হয়ে। শেয়াল ডাকছে এবং খুব কাছেই কুকুর ডেকে উঠল। প্রবল তন্দ্রা দুই চোখের পাতা টেনে ধরেছে।

তপতীর আধো-জাগরণ—আধো-নিদ্রার মাঝখানে। এই সময় তার মনে হল, মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে তাকে কেউ দেখছে। নিঃশ্বাসের হালকা বাতাস গালে লাগল।

কে, নিখিল? এতদূরে এসেও কি ওকে দেখতে হবে আমার মুখে-চোখে মৃত্যু-ইচ্ছা ফুটে উঠেছে কিনা? পাগল হয়ে গেল নাকি! এইভাবে ঘুমন্ত মানুষের মুখের কাছে দেশলাই জ্বেলে কি কিছু বোঝা যায়? আসলে ও নিজেই মরতে চায়, তারই ছায়া খুঁজে বেড়াচ্ছে রাতের পর রাত। এখানেও ছুটে এসেছে ক্ষ্যাপার মত। ওকে বলে দেওয়া দরকার, যা ভাবছ সব মিথ্যে, মিথ্যে। একটু আগেও মৃত্যু-ভয়ে সিঁটিয়ে গেছলাম আমি। কিন্তু তুমি কেন ভয় পাচ্ছ! আমার সম্পর্কে যা শুনছ, সবই মিথ্যা।

"তুমি কি বিশ্বাস করো সেই রটনা?" তপতী চোখবন্ধ রেখে ফিসফিস করে বলল।

"আমি বুঝতে পারছি না।"

"কেন, আমাকে তো তুমি জান।"

তপতী উত্তরের প্রতীক্ষায় রইল এবং অবশেষে মৃদু গাঢ় স্বরে উত্তর এল, "না।"

"তাহলে তুমি রটনা বিশ্বাস করেছ? বল, বল, উত্তর দাও।"

"আমি জিততে চাই, দখল করতে চাই। পুরুষমাত্রেই চায়। সবাই আমার পরাজয়ের কথা বলছে! আমি সহ্য করতে পারছি না, আমি দুর্বল একথা মানতে পারছি না, আজও না। আমি অপেক্ষা করছি প্রমাণ দেবার জন্য। কিন্তু তুমি চলে গেলে কেন, আগে বলো কেন এভাবে চলে গেলে!"

এই কাতরকণ্ঠে মথিত হল তপতীর অন্তর। ধীরে ধীরে চোখ খুলল সে। চারিদিকে নিরন্ধ্র অন্ধকার। ভ্যাপসা সোঁদা গন্ধ আর মাথার উপর ঝুকেপড়া মানুষের মাথার মত মশারি দেখে বুঝতে পারল, এখন সে কোথায়। এতক্ষণ তাহলে স্বপ্নে কথা বলে

যাচ্ছিল নিখিলের সঙ্গে! দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফিরতেই সে দেখল, অন্ধকার ঘরের মধ্যে গাঢ়তর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মানুষের একটি অবয়ব। হৃদস্পন্দনের বেগ দ্রুত হল তার, ক্ষীণকণ্ঠে সে বলল, "কে?"

অবয়বটি চমকে সিধে হয়ে, নিঃশব্দ লঘুগতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তপতী বিমূঢ় ভাব কাটিয়ে উঠে ভাবল, কিন্তু নিখিল আমায় জীবিত থাকার জন্য কাতর অনুরোধ করেছিল। তবে কেন প্রচণ্ড অন্ধকারের মত এল এই ভয়! আমার জন্য অপেক্ষা করছে বলল, কিন্তু কেন? এও কি আমায় প্রতিরাতে পাহারা দেবে?

বাকি রাতটুকু জেগে, দেরীতে ঘুম ভাঙ্গল তপতীর। বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই হাঁসের ডাক শুনল। দেখল নারকেল গাছ বেয়ে একটা কাঠবেড়ালি কিছুটা উঠেই আবার দ্রুত নেমে গেল। আকাশের অনেক উঁচু দিয়ে নিঃশব্দে একটি বিমান চলে যাচ্ছে, অনেকক্ষণ ধরে তপতীর চোখ সেটিকে অনুসরণ করল। তারপর প্রভাতের গন্ধ, রঙ, শব্দ, বাতাস এবং গতি আপন দেহে ও মনে শোষণ করতে করতে তপতী নিজেকেই বলল, আশ্চর্য! আমার যে ভাল লাগছে!

"কাল তোমার সঙ্গে বোধহয় খারাপ ব্যবহার করেছি।"

ঘুরে দাঁড়াল তপতী। বারান্দার অপর প্রান্তে নিজের ঘরের দরজায় সরোজবরণ দাঁড়িয়ে।

"কেউ আমার দিকে লুকিয়ে তাকাচ্ছে, এটা আমি সহ্য করতে পারি না। কেন, তা আমি জানি না। তবে তখন আমার ইচ্ছে করে—"

সরোজবরণ থেমে যেতে তপতীর কৌতূহল বাড়ল। প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল—কি ইচ্ছে করে? সরোজবরণ সেটা বুঝেই যেন বলল—"আমার সম্পর্কে নিশ্চয় অনেক কিছু শুনেছ?"

তপতী ইতস্তত করল। অনেক কিছুই সে শুনেছে, কিন্তু মুখের

উপর বলা উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছে না। শুধু সহজাতবোধ-দ্বারা সে বুঝেছে, এখানে থাকতে হলে এই লোকটিকে চটান উচিত নয়।

"কি শুনেছ আমার সম্পর্কে ?" সরোজবরণ যেন দাবী করল। ধরে নিয়েছে তপতী অবশ্যই কিছু শুনেছে।

"কিছু শুনিনি।"

বিস্মিত চোখে সরোজবরণ বলল, "সেকি! বাপ থাকতেও মেয়ে মামারবাড়িতে মানুষ হচ্ছে, এতে তোমার মনে প্রশ্ন ওঠেনি ? তুমি জিজ্ঞাসা করোনি কাউকে, কেন এমন হল ?"

সরোজবরণ ধীরে ধীরে এগিয়ে এল। ওকে এখন স্বাভাবিক এক বৃদ্ধের মতই দেখাচ্ছে। ওর চোখের কোণের চামড়ায় তপতী ফাটল দেখতে পাচ্ছে। প্রভাতের এই স্নিগ্ধতার সঙ্গে এই বৃদ্ধ এখন আর বেমানান নয়।

"জিজ্ঞাসা করেছিলাম দিদিমাকে।" কথাগুলো বলে তপতী লক্ষ্য করল, সরোজবরণের দাঁড়াবার ভঙ্গি গভীর উৎকণ্ঠায় কঠিন হয়ে উঠল। "কিন্তু পরিষ্কার কোন জবাব পাইনি। বলেছিল আপনার নাকি মাথা খারাপ। তাই ওরা আমাকে কাছে এনে রেখেছে।"

নিঃশব্দ হাসিতে ভরে গেল সরোজবরণ। "আমাকে তাহলে পাগল বানিয়ে দিয়েছিল! দেখছ তো এখন আমায়, কি মনে হচ্ছে, মাথা খারাপ ?"

তপতী দেখল সরোজবরণের দুই চোখ মজা পাওয়ার সুখে ঝকমক করছে। তার মনে হল, এই বৃদ্ধ স্বেচ্ছানির্বাসনে যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয় ওঁর মধ্যে রয়েছে, নয়তো এই নিঃশব্দ হাসিটা প্রভাতের রৌদ্রে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসত না ওঁর কণ্ঠে।

"কি মনে হচ্ছে, পাগল ?"

তপতীর হঠাৎ বিমান মৈত্রকে মনে পড়ল। ঠিক এই রকম

স্বরে, এইভাবে তাকিয়ে বলেছিলেন—চুলে আঙুল ডুবিয়ে দেখতে চাও? তাহলে দেখো। বিমান মৈত্র মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়েছিলেন।

"মনে হচ্ছে আপনি অনেকদিন আগে একবার পাগল হয়ে গেছলেন।"

"তাই নাকি। কেন বল তো?" সরোজবরণের দেহ স্পষ্টতই কঠিন হয়ে উঠল।

"শুনেছি আপনি নাকি আমার মাকে খুন করে পুকুরে ফেলে রটিয়েছিলেন, ডুবে মরেছে।"

তপতী ধরেই নিল এবার ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটবে। হঠাৎ কথাগুলো মুখ থেকে বেরিয়ে এল কেন সে বুঝে উঠতে পারল না। তার এতটা সাহস বা নির্ভরতার উৎপত্তি কোন্‌টা, এই প্রভাতবেলা না গতরাত!

কিন্তু সরোজবরণ ভয়ঙ্কর কিছুই ঘটাল না। ফ্যাকাসে মুখে স্থির দৃষ্টিতে তপতীর দিকে তাকিয়ে রইল। মুখভাবে আঘাত পাওয়ার ছাপ ফুটে রয়েছে। তপতী অনুতপ্ত হল।

"তোমাকে এ কথা কে বলল?"

"অনেকেই। মামা, দিদিমা এঁরা সবাই বলেছে।"

"আর কেউ?"

মাথা নাড়ল তপতী।

অবিশ্বাসভরে সরোজবরণ তাকিয়ে রয়েছে দেখে তপতী বলল, "আর কে বলবে! ওসব কথা বলার মত লোক কেউ তো আর নেই।"

সরোজবরণ কিছুক্ষণ দূরের মাঠের উপর দৃষ্টি রেখে আবার ফিরিয়ে এনে তপতীর মুখে স্থাপন করে ধীর জলদকণ্ঠে বলল, "তুমি বিশ্বাস করেছ ওই কথা।"

তপতী অস্বস্তিভরে নীরব রইল।

"পুকুরটা তোমার ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যায়। আমি ওই জানলা দিয়েই দেখতে পাই তোমার মাকে ভাসতে।"

হঠাৎ সরোজবরণ দুহাত বাড়িয়ে তপতীর কাঁধে দশটা আঙুল হুকের মত আটকে তাকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, "আগাগোড়া মিথ্যে, বানানো কথা এসব। শুধু একটা লোক জানে, সে বলতে পারে, সে তখন এখানেই উপস্থিত ছিল।"

"কে সে!" তপতী রুদ্ধশ্বাস বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল।

"তোমার মায়ের প্রেমিক।"

"বিমানমামা, বিমান মৈত্র।" তপতী প্রশ্ন করল না, শুধু ঘোষণা করল। "তিনি মারা গেছেন।"

সরোজবরণ মুহূর্তে পাংশু হয়ে গেল। তপতীর কাঁধ থেকে হাত দুটি তুলে নিয়ে বিধ্বস্ত কণ্ঠে বলল, "তোমায় এ সম্পর্কে কিছু বলেনি সে?"

তপতী অস্ফুটে বলল, "মার সম্পর্কে কোন কথাই বলতেন না।"

অবিশ্রান্ত রৌদ্র বারান্দার বাইরে প্রকৃতিকে ঐশ্বর্যদান করে চলেছে। তারই আভা ঢাকা বারান্দায় মুখোমুখি দাঁড়ান এই দুই নরনারীর চোখে বিস্ময়ের রূপ ধরে প্রতিফলিত। তারপর, দীর্ঘ বারান্দাটা মাথা ঝুঁকিয়ে, নিঃস্ব হয়ে যাওয়া বিত্তবানের মত অবিচল পদক্ষেপে অতিক্রম করে সরোজবরণ নিজের ঘরে ঢুকে গেল। তপতীর কাছে, এইভাবে চলে যাওয়াটা হেঁয়ালির মত ঠেকল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল সে বারান্দায়। মনের নিঃসঙ্গতা তার কেটে যাচ্ছে সরোজবরণের অদ্ভুত আচরণে। বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে তপতী ঘরের মধ্যে এল। চেয়ারটার ধুলো ঝেড়ে ঘুরিয়ে জানলার দিকে মুখ করে বসতেই, পুকুরটা চোখে পড়ল। কাকচক্ষু, টলটলে জলে ভরা। বাঁধানো সিঁড়ির ধাপগুলো ভাঙা, শ্যাওলায় কালো। খুব সাধারণ দেখতে পুকুরটাকে। কিন্তু এখন তপতীর মনে হচ্ছে অসাধারণ। একদৃষ্টে তাকিয়ে না-দেখা মায়ের কথা চিন্তা করতে গিয়ে বারবার রুবিকেই তার মনে পড়ল। দুই চোখ বেয়ে জল নেমে এলেও সে স্থির হয়ে বসে রইল।

॥ তেরো ॥

তপতী জেগেই ছিল।

রাতের পর রাত সে অপেক্ষা করেছে, আবার কবে আসবে। তারপর এল নিঃসাড়ে। দীর্ঘ গাঢ় অন্ধকারটা ওর পাশে এসে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে ঝুঁকে মুখের কাছে মুখ আনল, তখন তপতী হাতটা চেপে ধরে বলে উঠল, "কেন ?"

এই প্রশ্নটি করার জন্য তপতী সুযোগ খুঁজছিল। সরোজবরণ নিজের ঘর থেকে আর বেরোয়ই না। বারান্দায় পাতা ইজিচেয়ারটায় মাঝে মাঝে বসে। দুহাতের তালু মাথার পিছনে রেখে একদৃষ্টে দূরের কোন স্মৃতির দিকে যেন তাকিয়ে থাকে। তপতীকে দেখলেই উঠে ঘরে চলে যায়।

বীণা রোজ দুবেলা এসে রান্না করে, ঘর মোছে, জল তোলে, কাপড় কেচে দেয়। তপতী ওর সঙ্গে গল্প করার চেষ্টা করেছিল। বীণার বলার কথা খুবই সামান্য। শোনার আগ্রহও অতি অল্প। তার স্বামী, পুত্র, সংসার, গ্রাম, মাছ ধরার পোলো, হাঁস, হাট, ষষ্ঠীতলা ইত্যাদি সম্পর্কে যা কিছু বলার, চার-পাঁচ দিনেই বলা হয়ে গেছে। তপতী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওর কাছ থেকে জানতে চেয়েছে এই বাড়ির কথা, সরোজবরণের এই রকম নিঃসঙ্গ জীবন-যাপনের কারণ। কিন্তু বীণা কিছুই বলতে পারেনি। হয়তো হরপুরের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বলতে পারে, এই ভেবে তপতী ওকে জিজ্ঞাসা করে, "তোমাদের এখানে সব থেকে বুড়ো কিংবা বুড়ি কে আছে এখন ?"

বীণা ভেবেচিন্তে পাঁচটি নাম বলে। তপতী ওকে সঙ্গে করে তাদের প্রত্যেকের কাছে যায়। তারা প্রথমে আড়ষ্ট হয়ে কথা বলে, তারপর যৌবনকালের কথা মনে করার জন্য চুপ করে থাকে,

অবশেষে মাথা নাড়ে। শুধু এক বুড়ি বলেছিল, তার বোন কাজ করত ওই বাড়িতে। কিন্তু ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেই ওলাওঠায় সে মরে গেছে। না, তার কাছ থেকে আর বেশি কিছু শোনেনি। তবে অত রাত্রে পুকুরে কেন নাইতে গেছল তাই নিয়ে গ্রামের অনেকে তখন বলাবলি করেছিল।

এরপর সময় কাটাবার জন্য তপতী বাড়ির পোড়ো উঠোনে সব্জি চাষ শুরু করে। বীণাকে দিয়ে মাচা বাঁধিয়ে লাউ আর কুমড়ো গাছের পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়। উঠোন থেকে মাঝে মাঝে আড়চোখে দেখে, সরোজবরণ বারান্দায় এসে বসেছে। মাঝে মাঝে সে ভাবে, পারে কি করে একটা লোক মানুষের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে এই রকম স্বেচ্ছানির্বাসনে বছরের পর বছর কাটিয়ে যেতে! কেন, কেন? কেন এইভাবে শূন্য চোখে শূন্য দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বসে থাকা!

হাতটা চেপে ধরে তপতী বলে উঠল, "কেন?"

"তুমি কেন এখানে এসেছ?" পাল্টা প্রশ্ন করল সরোজবরণ।

তপতী ধীরে ধীরে হাতটা ছেড়ে দিল। অন্ধকার নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে উত্তরের অপেক্ষায়। দুজনের গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পরস্পরকে আঘাত করছে। কিছুক্ষণ পর অন্ধকার অধৈর্যে দুলে উঠতেই তপতী ফিসফিস করে বলল, "আমার জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল, তাই পালিয়ে এসেছি।"

"কেন?"

"সকলে সন্দেহ করছে বিমান মৈত্রের সঙ্গে আমার অবৈধ সম্পর্ক ছিল।"

"সেকি! তোমার স্বামীও কি তাই মনে করে?"

"না। সে চায় নিজের মর্যাদা বজায় রাখতে।"

তপতী উত্তেজিত হয়ে উঠে বসল, "সে চায় প্রমাণ করতে বিমান মৈত্র আমায় মেয়ের মত ভালবাসতেন তাই উইল করে বাড়িটা দিয়ে গেছেন। সে চায়—"

"কি বললে ?" সরোজবরণ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। "বিমান মৈত্র তোমায় তার বাড়ি দিয়েছে ?"

"হ্যাঁ, বসত বাড়িটা।"

নীরবতা প্রবল বিস্ময়ের নামান্তর হয়ে ঘরে বিরাজ করতে লাগল। অবশেষে বিস্ময়োত্তীর্ণ সরোজবরণ হাত বাড়িয়ে তপতীর কপাল স্পর্শ করল। কাঁপছে আঙুলগুলো। তপতী অনুভব করল, এই বৃদ্ধের অভ্যন্তরে তুমুল প্রবাহ চলেছে। কিন্তু অসাধারণ শান্ত ও ধীর কণ্ঠে সরোজবরণ বলল, "এই মুহূর্তে জানলাম সবাই যা সন্দেহ করেছিল সেটাই সত্য। তুমি আমার মেয়ে নও।"

"তাব মানে ?" তপতী আশ্চর্যতার স্তর ছাড়িয়ে বোধশূন্যতার দিকে ছিটকে পড়ল।

"আমি থাকতাম ঝরিয়ায়, তোমার মা ছিল এখানে। তখন সে প্রায়ই আসত। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম নীলিমাকে কিন্তু ও জবাব দিতে অস্বীকার করে। অনেক অনুনয়-বিনয় করেও মুখ খোলাতে পারিনি। তুমি বুঝবে না তখন আমার কি অসহ যন্ত্রণা।" সরোজবরণ হঠাৎ চুপ করে গেল। বহু বছর আগের সেই যন্ত্রণার স্মৃতি যেন মুচড়ে ধরেছে কণ্ঠনালী। মাথাটি ঝুঁকিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল সে। আর তপতী রুদ্ধশ্বাসে শুনতে শুনতে ফিরে এল উত্তেজনার বাস্তবতায়।

"তাহলে আমার মা খুনই হয়েছিলেন। তাহলে লোকে যা সন্দেহ করেছিল সেটাই ঠিক।"

"কি ঠিক ?" চাপাস্বরে বৃদ্ধ গর্জন করল।

"স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ করে, যন্ত্রণায় পাগল হয়ে তাকে গলা টিপে মেরে পুকুরে ফেলে দিয়েছিলেন।"

সরোজবরণ ক্ষিপ্তের মত বলে উঠল, "আগাগোড়া মিথ্যা, বানানো। একমাত্র সে জানত, সে বলতে পারত, সে উপস্থিত ছিল তখন।" সরোজবরণ গরগর করে উঠল। উত্তেজনা বশ করতে করতে বলল, "কলকাতা থেকে ওকে সঙ্গে নিয়ে যখন হরপুরে পৌছই,

তখন রাত এই রকমই। তুজনকে ঠিক এইখানে," সরোজবরণ মেঝেয় লাথি মারল, "দাঁড় করিয়ে বলেছিলাম, মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে তোমরা বলো, এ তোমাদের সন্তান নয়। অস্বীকার করো তোমরা।"

তপতী দম বন্ধ করে বলল, "তারপর।"

"ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল সে। আমি চেপে ধরলুম। আমায় লাথি মেরে বারান্দায় ফেলে দিয়ে চলে গেল। ওর পিছনে তোমার মা-ও ছুটে বেরিয়ে গেল অন্ধকারে। এই ঘরে তখন তুমি আর আমি। তুমি জেগে উঠে কাঁদছিলে। আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না কি করব। শেষে তোমাকে কোলে নিয়েই টর্চ হাতে বেরোলাম।

বাঁধের রাস্তা দিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলাম। তুজনের কাউকেই দেখতে পেলাম না। ঘরে এসে এই জানলাটায় দাঁড়ালাম। মনে হল পুকুরঘাটে কে যেন বসে। ছুটে এসে দেখলাম সে একা বসে আছে সিঁড়িতে। টর্চের আলোয় তুহাতে মুখ ঢাকল। জিজ্ঞাসা করলাম, নীলিমা কোথায়? জবাব না দিয়ে উঠে চলে গেল। আমার পক্ষের প্রধান সাক্ষী তুমিই, কিন্তু তখন তোমার বয়স এগারো মাস। তুমি জান না, সব কিছু ঘটেছে তোমারই চোখের সামনে।"

"ওরা স্বীকার করল না কেন?"

তপতী উত্তর পেল না। বেড়ালের মত নিঃসাড়ে সরোজবরণ ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

॥ চোদ্দ ॥

তারপর একদিন বিকেলে নিখিল এল। ঘরের জানলার ধারে চেয়ারটিতে বসে তপতী সূর্যাস্ত দেখছিল। সূর্যটি তখন তার চোখের সমান্তরালে, খালের ধারে বাঁধের রাস্তার উপরই ঘোর কমলা বর্ণ।

এই সময় প্রকৃতি ব্যাপ্ত হয়ে মমতা উথলায়। হৃদয় বিষণ্ণতার অনুগামী হয়, প্রত্যাবর্তনের ক্লান্ত ভঙ্গি অস্তগামী সূর্যকিরণ-নির্মিত ছায়ার দ্বারা ভূপৃষ্ঠে সঞ্চরণ করে। তপতী প্রতিদিন এই জানলা দিয়ে সূর্যাস্ত দেখে। সরোজবরণ তখন বারান্দার এক প্রান্তে ইজিচেয়ারে শুয়ে অপেক্ষা করে তপতীর জন্য। সন্ধ্যা নেমে এলে তপতী ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দার অপর প্রান্তে চেয়ারে বসবে। বারান্দার মাঝখানে হারিকেনটি রেখে দিয়ে বীণা গৃহে ফিরে যায়। সরোজবরণ এখন প্রতিদিনই একতলায় নামে। উঠোনে, তপতীর লাগানো আনাজের গাছগুলির তদারকে বহু সময় ব্যয় করে। বৃক্ষের জীবনে চাঞ্চল্যের বিকাশ, প্রবল আনন্দ ও বিস্ময় সহকারে আজকাল সে দেখে এবং তার অংশীদার হবার জন্য তপতীকেও ডেকেছিল দু-তিনদিন। তপতী দোতলা থেকে নামেনি। আর সে নামে না। কিছুই তার আগ্রহের বৃত্তে আবদ্ধ হয় না আর। সন্ধ্যায় বারান্দায় বসে সরোজবরণ গল্প বলে বাল্যের, কৈশোরের আর কয়লাখনির। তপতী চুপচাপ বসে থাকে।

এমন সময়, এক সূর্যাস্তের প্রাক্কালে নিখিল এল। তপতী দূর থেকে দেখছিল বাঁধ ধরে একটি লোক আসছে। আসতে আসতে সূর্যের কিনারে তখন পৌঁছেছে। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে, কোমর থেকে ঊর্ধ্বাংশ সামনে দুলিয়ে-দুলিয়ে হেঁটে আসা দীর্ঘ শীর্ণ এই কাঠামোটিকে তপতী চিনল। হঠাৎ সে চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে, উত্তেজনায় থরথর করে উঠে জানলার গরাদ দু'হাতে আঁকড়ে ধরল। আবার সুযোগ এসেছে নিখিলের মাথার পিছনে জ্যোতিঃপুঞ্জ দেখতে পাওয়ার। নিখিলকে উদ্ধত-গ্রীবা অধিপতির মত দেখাবে। মাথার পিছনে বিকীর্ণ আভায় দম্ভ আর পৌরুষ ফেটে পড়বে। গায়ে কাঁটা তুলবে সেই দৃশ্য। হৃদয়ের গভীরে তখন কেউ যেন কাঁদবে, কেউ যেন হাসবে একই সঙ্গে। নিখিল কাছে এসে বলবে,—জমিটা আর তোমাকে যেন এক মনে হল। দু'জনেই যেন চিরকাল থাকবে।

এ কি! তপতী বিশ্বাস করতে পারছে না তার চোখকে। নিখিল হাঁটতে হাঁটতে প্রবেশ করে গেল ঘোর কমলা বর্ণের সূর্যটির ভিতরে। তখন তাকে কৃষ্ণবর্ণ একটি পিঁপড়ের মত দেখাল। সূর্যকে অতিক্রম করে যাবার পরও তপতীর মনে হতে লাগল নিখিল অতি অকিঞ্চিৎকর। দূর থেকে ওকে যে এত ক্ষুদ্র দেখাবে, জ্যোতিঃপুঞ্জ মাথার পিছনে ধারণ করার বদলে ও নিজেই যে তার অন্তর্গত হবে, এই অভিজ্ঞতার প্রভাবে তপতী উত্তেজনাচ্যুত হল। অপ্রতিভ বোধ করল ও, মনে মনে কুঁকড়ে গেল।

সন্তর্পণে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ইজিচেয়ারে শায়িত সরোজবরণকে সে বলল, "ও আসছে।"

হাসল সরোজবরণ। "জানি আসবে।"

বীণাকে ডেকে উনুন ধরাবার আয়োজন করতে বলল সরোজবরণ। তপতী বারান্দার অপর প্রান্তে সরে গিয়ে স্থির দৃষ্টিতে দূরের গাছপালার দিকে তাকিয়ে থাকল।

নিখিল এল। উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, পরিশ্রম এবং বয়স ওর শরীরে নিজেদের পাওনা আদায়ের সীলমোহর-ছাপ এঁকে দিয়েছে। সরোজবরণকে উপেক্ষা করে তপতীর কাছে গিয়ে সে প্রথমে হাসল, তারপর বলল, "তোমায় নিতে এসেছি। চটপট তৈরী হয়ে নাও। বেলাবেলি রওনা না হলে বাস ধরতে পারব না।"

"কোথায় যাব?" সামনে তাকানো চোখ না ফিরিয়ে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে দাঁড়ানো তপতীর এই অনুত্তেজিত স্বর শুনে নিখিলের ভ্রূ কুঞ্চিত হল।

"তার মানে? কোথায় আবার যাবে, আমার বাড়িতে!"

তপতী উত্তর দিল না। নিখিল আবার বলল, "প্রথমে রটাই তুমি মামার বাড়ি গেছ। কিন্তু ডলি তোমার নামে এমন সব কথা এখানে-ওখানে বলতে শুরু করল, তাই নয়, কার্তিক মৈত্রের কাছে গিয়ে বলেছে তার হয়ে সাক্ষী দেবে তোমার বিরুদ্ধে। তবে একটা রক্ষে, এখন ওকে প্রায় হাত-পা বেঁধেই রাখতে হয়।

মাথাটা একদমই গেছে। নয়তো খুব বেকায়দায় ফেলত।"

"রুবি কি করছে, কেমন আছে?"

"ভালই আছে। ওই তো এখন রান্না থেকে শুরু করে সব কাজ করছে। এত করে বললুম তবু পড়া ছেড়ে দিল।"

"এবার ওর বিয়ে দিয়ে দাও।"

"বিয়ে! ও তো বলছে বিয়ে করবে না।"

"প্রদীপ আসে?"

"না। ও অফিসার গ্রেডে প্রমোশন পেয়েছে।" হাতঘড়ি দেখে হতাশস্বরে নিখিল বলল, "আজ আর বোধহয় যাওয়া যাবে না। অন্ধকার ভেঙে দু মাইল এই সাপখোপের দেশে পথচলা! কাল ভোরে রওয়া হলে, আর অফিস কামাই করতে হবে না।" তারপর হেসে গলাটাকে ঘড়ঘড়ে করে বলল, "রোগা হয়েছ বেশ। বিয়ের সময়ের মতই প্রায় দেখাচ্ছে। আজ শরীর খারাপ-টারাপ হয়নি তো?"

গম্ভীর মুখে তপতী বলল, "যার বাড়িতে এসেছ, তার সঙ্গে আগে তোমার কথা বলা উচিত ছিল।"

ব্যস্ত হয়ে নিখিল এগিয়ে গেল ইজিচেয়ারে শোয়া সরোজবরণের দিকে। প্রণাম করে বলল, "আমি তপতীর স্বামী, আপনার জামাই।"

তপতী একতলায় রান্নাঘরে এসে বীণার কাছে বসল এবং রান্না শেষ না হওয়া পর্যন্ত উপরে উঠল না। বহু বছর পর এ বাড়িতে রাত্রে উনুন ধরান হয়েছে। বীণা নিজেই জাল ফেলে পুকুর থেকে কিছু মাছ ধরেছে। ওদের খাওয়ার সময় তপতী কাছে বসল। নিখিলের জন্য সরোজবরণ নিজের বালিশটি পাঠিয়ে দিল।

বিছানায় শুয়ে সিগারেট খেতে খেতে নিখিল বলল, "এই লোকটিই তো তোমার মাকে খুন করেছে!"

"কে বলল?" তপতী ঈষৎ তীব্র স্বরে বলল।

"তাইতো শুনেছি।"

"বাজে কথা। কিন্তু তুমি আমায় নিয়ে যেতে এসেছ কেন?"

"দুটো কারণে," নিখিল কাত হয়ে চেয়ারে বসা তপতীর দিকে

তাকাল। "তোমার অনুপস্থিতি লোকের মনে সন্দেহ জাগিয়েছে, আমিই তোমাকে কোথাও সরিয়ে দিয়েছি। না, খুন-টুন করেছি ভাবছে না, বলছে আমার মুখরক্ষার জন্যই নাকি তোমাকে অন্যত্র রেখেছি। কাজেই তোমাকে নিয়ে গিয়ে প্রমাণ করব, আমি কারুর তোয়াক্কা করি না। দ্বিতীয় কারণ, শিগগিরী হাইকোর্টে মামলা উঠবে। তোমাকে তৈরী হতে হবে এখন থেকেই।"

"কি দরকার, এত টাকা খরচ করে মামলা লড়ার?"

নিখিল কথাগুলোকে পাত্তা না দিয়ে অন্য কিছু চিন্তা করতে লাগল। হারিকেনের শিখা স্তিমিত হয়ে এসেছে, তপতী উস্কে দিল।

"মামলায় জিতবই। ওদের প্রধান সাক্ষী বিমান মৈত্রের ভাড়াটের ছেলে। গুণ্ডা টাইপের। সে নাকি স্বচক্ষে দেখেছে তোমাদের তুজনকে একই বিছানায়।"

"ওহ্।" তু হাতে মুখ ঢাকল তপতী।

"আমি অবশ্য ছেলেটাকে হাত করেছি টাকা দিয়ে। কত দিতে হয়েছে জান?" নিখিল জ্বলজ্বল চোখে তাকাল। গলাটাকে ভারী করে তাচ্ছিল্যভরে বলল, "পাঁচ হাজার, উপরন্তু যতদিন খুশি বিনাভাড়ায় থাকবে। জমিটা বিক্রি করে টাকা দিলাম।"

"তার মানে! তার মানে!" উঠে দাঁড়াল তপতী। "জমি বিক্রি করেছ? একদিন না বলেছিলে এই জমি আর আমি এক! জমি আর আমি চিরকাল থাকব!"

"নিশ্চয় থাকবে। কিন্তু তোমার সম্মান মর্যাদা আমার কাছে আরো বেশি দামী।"

"না, দামী নয়। তাহলে এই মিথ্যা কলঙ্কের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে, ঘুষ দিয়ে সেটা চাপা দেবার চেষ্টা করতে না। আসলে তুমি নিজের অহঙ্কারকে খুশি করতে চাও, কিন্তু তুমি অক্ষম, ক্ষুদ্র, অযোগ্য—তাই এই হীন উপায় অবলম্বন করেছ। তুমি মনে মনে বিশ্বাস করো এইসব রটনা।"

"কি বলছ তুমি!" নিখিল উঠে দাঁড়াল বিব্রত এবং বির মুখে। "আমি যদি বিশ্বাস করতাম তাহলে……তাহলে গলা টি তোমায় তখনি মেরে ফেলতাম।"

"তাহলে জেনে রাখ, লোকে যা বলছে, তার সবই সত্যি।"

দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। একের চোখ অপরের উপর স্থির নিবদ্ধ। অকম্প শিখার মত বা প্রোথিত শিলাখণ্ডের মত দুজনে অচঞ্চল, গতিহীন হয়ে। হারিকেনের বিবর্ণ আলো উভয়ের মুখ-মণ্ডলে মৃতদেহের শীতলতা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

"তুমি সত্যি বলছ?"

তপতী নিরুত্তর রইল।

"জবাব দাও। আমি আবার জিজ্ঞাসা করছি, তুমি সত্যি বলছ?"

থরথরিয়ে তপতীর ঠোঁট দুটি কাঁপতে শুরু করল। কথা বলা জন্য, না কথা ধরে রাখার চেষ্টায়, নিখিল বুঝতে পারছে না। এবা তার কণ্ঠস্বর বদলে গেল। অনুনয় করে বলল, "বলো, যাহো কিছু একটা বলো। আমায় জানতে দাও!"

"না, বলবে না।"

দুজনেই চমকে ফিরে তাকাল। দরজায় সরোজবরণ দাঁড়িয়ে।

"কেন বলবে না? কেন, কেন, বলবে না কেন?" চীৎকার করে উঠল নিখিল। "বলতেই হবে। ওকে আমি বাধ্য করব বলতে।" ওর দু হাতের আঙুলগুলো বেড়ির মত তপতীর গলায় চেপে বসল। ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলল, "কি দিতে পারিনি আমি। বলো কেন আমায় ভিখিরি করলে, বলো।"

সরোজবরণ তখন ডান হাতটি তুলে কুড়ুলের মত বসিয়ে দিয়েছে নিখিলের ঘাড়ে। অপ্রত্যাশিত আঘাতে নিখিল টলে পড়ছিল আলমারি ধরে ঘুরে দাঁড়াল।

হঠাৎ ফিসফিস করে তপতী বলল, "আমি মরব। এইবার আমি মরব।"

হারিকেনটাকে লাথি মেরে তপতী ছুটে বেরিয়ে গেল। অন্ধকার ঘরে দুজন, নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওর নামার শব্দ শুনল। উঠোনের ঘাসে খসখস শব্দ হল। সরোজবরণ অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলল, "ওর মা-ও এইভাবে ছুটে গিয়েছিল। পরদিন পুকুরে লাস ভাসছিল।"

"আপনি ধরার চেষ্টা করেননি?"

"করেছিলাম। তুমি করবে না?"

অনেকক্ষণ পর সরোজবরণ বিষণ্ণ কণ্ঠের উত্তর পেল—

"কিসের জন্য?"

দুজনে আর কথা হয়নি। ভোরের আলো ফোটার আগেই নিখিল চলে গেল। সরোজবরণ জানলায় এসে দাঁড়াল। রৌদ্র গাছের শীর্ষে সদ্য পৌঁছেছে মাত্র। বাতাসে এখনো শিশিরকণা লেগে। পাখিরা গতকালের প্রভাতে যে স্বরে ডেকেছে, আজও সেই স্বরে ডাকছে। সরোজবরণ পুকুরের মাঝখানে চোখ রাখল। টলটলে জলে আকাশ প্রতিবিম্বিত, কিন্তু তপতীর মৃতদেহ ভাসতে দেখল না। বিস্ময়ে চোখ তুলে একবার দূরে তাকাল। হনহন করে চলে যাচ্ছে নিখিল বাঁধের পথ দিয়ে। আবার চোখ নামাতেই নজরে পড়ল ঘাটের মাঝামাঝি ধাপে, সিঁড়ির গায়ে গা লাগিয়ে লম্বা হয়ে তপতী শুয়ে। শ্যাওলার সঙ্গে ওর শাড়ির রঙ মিশে যাওয়ায় প্রথমে চোখে পড়েনি। সরোজবরণের মনে হল তপতী ঘুমোচ্ছে

দ্রুত নেমে এসে পুকুরঘাটে গিয়ে সরোজবরণ অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল তপতীর মুখের দিকে। তখন ওর দুই চোখ প্রেমের বিষণ্ণতার আনত হল, ঠোঁটে নবীন করুণা উথলে উঠল এবং আঙুলের ডগায় আবেগ কম্পিত হল। তপতীকে জাগিয়ে তুলে সে প্রশ্ন করল, "কই, তুমি ডুবে মরলে না?"

ওর মুখের উপর সদ্য ঘুমভাঙা, ভোরের মত সংঘাতহীন শান্ত দুটি চোখ মেলে অবাক হয়ে তপতী বলল, "কেন?"

॥ পনেরো ॥

এরপর নিখিল আর হরপুরে আসেনি, কোনপ্রকার খোঁজখবরও নেয়নি। তপতীও মামলা সম্পর্কে কোন আগ্রহ বোধ করেনি। সে সারাদিন দোতলার বারান্দায় বা ঘরের জানলায় বসে চেয়ে থাকে আকাশের, মাঠের, গাছের, জলের দিকে। রোদে বৃষ্টিতে হাওয়ায় সে চোখ বন্ধ করে আর নীচের উঠোন থেকে উঠে আসা মজুরদের প্রতি সরোজবরণের পরিশ্রান্ত কণ্ঠের নির্দেশ, ধমক ও চকিত হাসি শোনে আর মনে মনে একটা বিরাট অশ্বত্থ গাছকে সে দেখে। গাছটার নীচে গোলাকার ঠাণ্ডা ছায়ায় প্রায়ই সে নিজেকে বসায়। তখন তার মনে পড়ে, আর শুধুই মনে পড়ে, আর মনে মনে খুঁজে বেড়ায় হারিয়ে যাওয়া একটি চতুর্থ পিলার। তবে হঠাৎ কখনো সূর্যাস্তের কালে সূর্যে চোখ পড়লে আজও তার বুকের মধ্যে থরথর করে।